মুক্তি, ওরে মুক্তি কোথায় পাবি: মুক্ত বাজারের সীমারেখা

মৈত্রীশ ঘটক, অমিতাভ গুপ্ত

কেউ যদি টাকার বিনিময়ে কর্মক্ষেত্রে শারীরিক বিপদের ঝুঁকি নিতে রাজি থাকেও, তাকে কি সেই অধিকার দেওয়া চলতে পারে? অর্থের বিনিময়ে গর্ভ ভাড়া দেওয়া কি একটা বিপজ্জনক পথের প্রথম ধাপ? কেউ নিজের কিডনি বা চোখের মণি বিক্রি করতে চাইলে তাঁকে সেই অধিকার দেওয়া উচিত হবে? কেউ স্বেচ্ছা-ক্রীতদাস হতে চাইলে, অথবা কেউ বিপুল অর্থের বিনিময়ে নিজের জীবন দিয়ে অন্য কাউকে তাঁর শরীরের কোন অবশ্যপ্রয়োজনীয় অঙ্গ (যেমন, হৃৎপিণ্ড) প্রতিস্হাপনের অধিকার দিতে চাইলে সেগুলো কি অধিকার হিসেবে স্বীকৃত হওয়া বিধেয়?

এই এলোমেলো প্রশ্নগুলোর মধ্যে একটা যোগসূত্র রয়েছে। প্রতিটা প্রশ্নই আসলে বাজারের পরিধি সংক্রান্ত। অর্থাৎ, বাজারের বাধানিষেধহীন বাণিজ্যকে আমরা কতখানি ঢুকতে দেব আমাদের নিতান্ত ব্যক্তিগত পরিসরে, আমাদের শরীরের পরিসরে, আত্মার পরিসরেও? ব্যক্তিস্বাধীনতার যুক্তিকে কত দূর অবধি টেনে নিয়ে গেলে সেটা শেষ পর্যন্ত ব্যক্তিস্বাধীনতার পথেই অন্তরায় হয়ে দাঁড়াতে পারে? আবার, বাজারের মুক্ত বিনিময়ের যদি বিরোধিতা করতে চাই, সেটা কোন যুক্তিতে করব?

প্রশ্নগুলো আপাতদৃষ্টিতে অর্থনীতির হলেও, নৈতিক দর্শন, আইনশাস্ত্র, এমনকী রাজনীতিরও বটে। এই লেখায় আমরা চেষ্টা করব এই প্রশ্নগুলোর উত্তর খুঁজতে।

বাণিজ্যেতে যাবই

সেই ১৭৭৬ সালে অ্যাডাম স্মিথ সাহেব লিখে গিয়েছেন, আমরা মাংস পাওয়ার জন্য কষাইয়ের সদিচ্ছা বা মহানুভবতার ওপর নির্ভর করি না। সে নিজের স্বার্থেই মাংস বেচে। তাতে তার লাভ। "বাজারের অদৃশ্য হাত"

আমাদের প্রত্যেককে লাভের দিকে চালিত করে। কিন্তু বাজারের যুক্তি কি বাজারের গণ্ডির মধ্যেই আবদ্ধ থাকে? শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ গ্যারি বেকার, যিনি এ বছর মে মাসে মারা গেলেন, তাঁর মতে উত্তর হল "না"। আমাদের ব্যক্তিগত জীবনও বাজারের নিয়মকে অগ্রাহ্য করে চলতে পারে না। বিয়ে থেকে পরিবার পরিকল্পনা সব সিদ্ধান্তই এই লাভ-ক্ষতির অঙ্কে বাঁধা। বেকারের বাজার-কেন্দ্রিক জীবনদর্শনের ভিত্তি হল মনুষ্যচরিত্র এবং বাজার সম্বন্ধে কতগুলি বিশ্বাস। এক, মানুষ খামখেয়ালি নয়, সে যে কোনও পরিস্থিতিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে কোন নির্দিষ্ট লক্ষ্য মাথায় রেখে। দুই, যে কোনও সিদ্ধান্তে লাভ ও ক্ষতি দুই-ই আছে, তাই সেটা নেওয়া হবে কিনা তার নীট যোগফলের ওপর নির্ভর করে। তিন, দুজন প্রাপ্তবয়স্ক মানুষ যদি স্বেচ্ছায় এবং স্বজ্ঞানে কিছু কেনাবেচা করে, তাহলে তাতে দুপক্ষেরই লাভ আছে, তাই কোনও রকম বাধা দেওয়া অনুচিত ।

তার মানে কি বিনিময়ের অধিকারের ওপর কোথাও কোন নিয়ন্ত্রণ থাকা প্রয়োজন নেই?

অনেক ভাবেই এই প্রশ্নের উত্তর খোঁজা সম্ভব। এই লেখায় আমরা মূলধারার অর্থনীতির যুক্তি ব্যবহার করে সেই চেষ্টা করব। যে কোনও বিনিময়ই প্রকৃত প্রস্তাবে সম্পদ বণ্টনের গল্প। কী ভাবে অর্থনৈতিক সম্পদ বণ্টন করা উচিত, তার তিনটে পৃথক মাপকাঠি প্রচলিত। প্রথমটা efficiency বা কুশলতার মাপকাঠি। দ্বিতীয়টা equity বা fairness, মানে ন্যায্য বণ্টনের মাপকাঠি। তৃতীয়টা liberty বা স্বাধীনতার মাপকাঠি। এই লেখায় তিনটি মাপকাঠিরই ব্যবহার থাকবে। ফলে, গোড়ায় এই মাপকাঠি তিনটে সম্বন্ধে কয়েকটা প্রাথমিক কথা বলে রাখা যাক।[1]

কুশলতার মাপকাঠি বলবে, যে সম্পদের শ্রেষ্ঠ ব্যবহার করতে পারবে, যে কোনও অর্থনৈতিক সম্পদ তার হাতে যাওয়াই বিধেয় । যার কাছে সেই পণ্যের মূল্য সর্বাধিক , যে কোনও পণ্য তার পাওয়া উচিত । যে সম্পদের সবচেয়ে কুশলী ব্যবহার করতে পারবে, তার হাতে পৌঁছলেই সেই সম্পদের মূল্য সর্বাধিক হবে। ফলে, তার পক্ষে সেই সম্পদের আদি মালিককে এমন দাম দেওয়া সম্ভব হবে, যেটা সেই মালিকের পক্ষেও লাভজনক, আবার তার নিজের পক্ষেও। সেই দামে দুপক্ষই বিনিময়ে সম্মত হবে।

এই সহজ যুক্তির আড়ালে অবশ্য দুটো কথা চাপা পড়ে আছে। এক, যে মানুষটা এমনিতে গরিব, অন্যদের তুলনায় কোনও পণ্য তার কাছে বেশি মূল্যবান হলেও দাম দেওয়ার ক্ষেত্রে অন্যদের টপকে যাওয়ার আর্থিক ক্ষমতা তার নেই। ফলে, সে সম্পদটিকে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ মনে করলে বা তার সবচেয়ে কুশলী ব্যবহার করতে সক্ষম হলেও, দারিদ্রের কারণে সেটা তার আয়ত্তের বাইরে থেকে যাবে। আর দুই, ক্রেতা ও বিক্রেতা, উভয় পক্ষের কাছেই যে বিনিময় লাভজনক, কোনও তৃতীয় পক্ষের ওপর তার negative externality বা নেতিবাচক অতিক্রিয়া থাকতে পারে। আমার বাড়ি আমি প্রোমোটারকে বেচে দিলাম কিন্তু নতুন যে বহুতল হল তাতে পাড়ায় অন্যদের জলের সমস্যা হল বা শব্দদূষণ বেড়ে গেল, সেটা হল অতিক্রিয়ার উদাহরণ। ফলে, কুশলতার মাপকাঠিতে হিসেব করার সময় এই নেতিবাচক অতিক্রিয়ার কথা মাথায় রাখতে হবে।

ন্যায্য বণ্টন বললে অনেক কিছুই বোঝানো যেতে পারে। যিনি কথাটি ব্যবহার করছেন, কথাটির অর্থ তাঁর ওপর নির্ভরশীল। কিন্তু, সেই সব মানের একটা অন্তর্নিহিত মিল রয়েছে। সেটা এই রকম— ব্যক্তি-পরিচয় নির্বিশেষে সমদর্শী হওয়া। সেই সমদর্শী আচরণ কোনও একটি নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে সব মানুষের প্রতি হতে পারে। ধরা যাক, কোনও দেশে খাদ্যসংকট দেখা দিল। সে সময় সমদর্শী আচরণের অর্থ, যেটুকু খাবার আছে, তার ওপর সবার সমান অধিকার স্বীকার করে নেওয়া। সেটা খাবারের সমবণ্টনের মাধ্যমে হতে পারে, "আগে-এলে-আগে-পাওয়া-যাবে"র ভিত্তিতে বণ্টন হতে পারে, অথবা লটারির মাধ্যমে বণ্টনও হতে পারে। শেষ দুটি ক্ষেত্রে সবাই খাবার পাবেন না ঠিকই, কিন্তু খাবার পাওয়ার বা না পাওয়ার সম্ভাবনা সবার ক্ষেত্রেই সমান হবে। আবার, কোনও একটি নির্দিষ্ট ঘটনার প্রেক্ষিতেও সমদর্শী হওয়া সম্ভব। কোনও একটি পরিস্থিতিতে আমি থাকলে অন্যদের থেকে কোন আচরণটি প্রত্যাশা করতাম, সে কথা মাথায় রেখে সেই পরিস্থিতিতে থাকা মানুষদের সঙ্গে আচরণ করাও সমদর্শিতা। এই ন্যায্য বণ্টনের যুক্তির বিপরীতে সবচেয়ে পরিচিত যুক্তি হল, কিছু জিনিসের ক্ষেত্রে এমন সাম্য প্রতিষ্ঠা করা অসম্ভব। যেমন, মেধা বা প্রতিভার অসাম্য কোনও বণ্টনের মাধ্যমেই দূর হওয়ার নয়। আবার, সুখী হতে পারার ক্ষমতাও সবার সমান নয়। কাজেই, সম বণ্টনে কার উপভোগের মাত্রা কী দাঁড়াবে, সে কথাই বা কে বলবে? এ ক্ষেত্রে ন্যায্য বণ্টনের নীতিটিকে আর একটু স্পষ্ট করে নেওয়া ভাল।

ফলাফলের সাম্য নয়, কিন্তু ফলাফলে পৌঁছনোর জন্য যে প্রক্রিয়া, সেটা যাতে সমদর্শী হয়, তা নিশ্চিত করাই এই মাপকাঠির মূল কথা।

তৃতীয় মাপকাঠি স্বাধীনতার। এই মাপকাঠি বলবে, আমাদের নিজেদের সিদ্ধান্ত নিজে করতে পারার স্বাধীনতাই সবচেয়ে জরুরি। এই দর্শনে সম্পত্তির অধিকারের প্রশ্নটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। নিজের শরীরও সেই সম্পত্তিরই অংশ। সম্মত প্রাপ্তবয়স্ক মানুষদের মধ্যে যে কোনও পারস্পরিক চুক্তির স্বাধীনতা এই দর্শনের মূল কথা। সেই স্বাধীনতায় কোনও বাধা পড়ুক, সেটা নিতান্তই অকাম্য। নিজের সম্পদের ওপর রাষ্ট্র বা সমাজ, কারও খবরদারিই এই মাপকাঠিতে অগ্রহণযোগ্য। এই দর্শনের ক্ষেত্রে মনে রাখা প্রয়োজন, বিভিন্ন মানুষের ব্যক্তিস্বাধীনতা আসলে একে অপরের সঙ্গে যুক্ত। ফলে, যত ক্ষণ আমার ব্যক্তিস্বাধীনতার প্রয়োগ অন্য কারও ব্যক্তিস্বাধীনতাকে খর্ব না করছে, তত ক্ষণই সেই স্বাধীনতার প্রয়োগ সম্ভব।

এই লেখায় আমরা অধিকারের প্রশ্নটিকে consequentialist বা পরিণামবাদী দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেখব। অর্থাৎ, বাজারের গুণাগুণ বিচার করা হবে মানুষের ওপর সেই বাজারের সম্পদ বণ্টনের পদ্ধতির পরিণামের মাপকাঠিতে। সব ক্ষেত্রেই যে এই পরিণাম উপভোগের মাপকাঠিতে মাপা হবে, তা নয়। আয়, দারিদ্র, স্বাস্থ্য, বা প্রত্যাশিত আয়ুর মতো সূচকও পরিণামের মাপকাঠি হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে। এই পরিণামবাদী দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে right-based বা অধিকার-ভিত্তিক মাপকাঠির প্রাথমিক ফারাক রয়েছে। দ্বিতীয় মাপকাঠি বলবে, বাজার মানুষের কিছু প্রাথমিক অধিকার, যেমন অবাধে মেলামেশার অধিকার অথবা শিক্ষার অধিকার বা অন্য কোনও অধিকার, দিচ্ছে কি না, সেটাই মূল কথা। সেই অধিকার প্রয়োগের ফল কী দাঁড়াল, সেটা বিচার্য নয়।[2] আরও মনে রাখা প্রয়োজন, কোনও বিকল্প বণ্টন ব্যবস্থার কথা না বলে কোনও একটি বাজারকে নিয়ন্ত্রণ বা নিষিদ্ধ করার গুণাগুণ বিচার করা যাবে না। যেমন, কিডনির বাজারকে নিষিদ্ধ করতে হলে তার জন্য বিকল্প কোনও ব্যবস্থার কথা বলতে হবে। যেমন, কিডনি দান, অথবা বিনিময়, অথবা যে কোনও রকম কিডনি প্রতিস্থাপনকেই নিষিদ্ধ ঘোষণা করা। প্রতিটি বিকল্পই আবার বিভিন্ন মানুষের জীবনে বিভিন্ন ভাবে প্রভাব ফেলবে।

প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের স্বেচ্ছা বিনিময়ের অধিকারের পক্ষে অর্থনীতির যে ঘরানা সবচেয়ে সরব, সেই শিকাগো স্কুলের মিলটন ফ্রিডম্যানের মতে, যদি কোনও বিনিময়ে দুপক্ষই সম্মত হন এবং দুপক্ষের কাছেই সেই বিনিময় সংক্রান্ত পূর্ণ তথ্য থাকে, তবে সেই বিনিময় থেকে দুপক্ষই লাভবান হবেন।[3] একটু অন্য ভাষায় বললে, মিয়া বিবি রাজি তো ক্যা করেগা কাজি? এই যুক্তির খাদ তার পূর্বশর্তে— উভয় পক্ষের কাছেই বিনিময় সংক্রান্ত পূর্ণ তথ্য আছে এবং সেই তথ্য বিশ্লেষণ করে সমস্ত ভালো মন্দ বিচার করে সিদ্ধান্ত নেবার ক্ষমতা আছে। বহু ক্ষেত্রেই দেখা যায়, হয় এক পক্ষের কাছে সম্পূর্ণ তথ্য নেই (হয়তো তাঁদের খবর জানার উপায় নেই, অথবা তাঁদের ইচ্ছাকৃত ভাবে ভুল বোঝানো হয়েছে), আর নয়তো বিনিময়ের সম্পূর্ণ তাৎপর্য বোঝা তাঁদের ক্ষমতার বাইরে। কিডনি বিক্রির ক্ষেত্রেই যেমন বহু মানুষ পরে আফসোস করেছেন, কারণ বিক্রি করার সময় তাঁ রা ভাবতে পারেননি, এই সিদ্ধান্তের ফলে ভবিষ্যতে তাঁদের শারীরিক সক্ষমতা কতখানি হ্রাস পাবে। Rational choice বা যুক্তিসঙ্গত চয়নের তত্ত্ব যে ভাবে সবার কাছে সম্পূর্ণ তথ্য থাকাকে এবং সেই তথ্য ব্যবহার করে সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতাকে স্বাভাবিক হিসেবে ধরে নেয়, সেটা বাস্তবানুগ নয়।

আমাদের কারও কাছেই কোনও সিদ্ধান্ত এবং তার তাৎপর্য সংক্রান্ত সম্পূর্ণ তথ্য নেই। সমস্ত প্রাসঙ্গিক তথ্য হাতের কাছে থাকলেও আমরা যে সিদ্ধান্ত নিই, সবসময় তার সমস্ত পরিণাম আমরা ভালো করে বুঝে যে নিই, তা নয়। আমাদের মধ্যেই অনেকগুলো সত্তার নিত্য সংঘাত চলে, এবং এরকম ভাবার কারণ নেই যে সব সময়ে আমরা সব দিক বিবেচনা করে, এই সব সত্তার নানা দাবির মধ্যে সমঝোতা করে সঠিক সিদ্ধান্ত নিই। যেমন, আমরা অনেক সময়েই যাহা চাই তাহা ভুল করে চাই , যাহা পাই তাহা চাই না! গবেষণায় দেখে যাচ্ছে যে তাৎক্ষণিক সুখ, প্রয়োজন বা আকর্ষণ আর নিজের দীর্ঘমেয়াদী কল্যাণের মধ্যে নিরন্তর যে দ্বন্দ্ব, বাস্তব ক্ষেত্রে মানুষ অনেক সময়েই তার সন্তোষজনক নিষ্পত্তি করে উঠতে পারে না, বর্তমানে নেওয়া সিদ্ধান্ত নিয়ে পরে পস্তায় । ক্রমশ মূলধারার অর্থনীতিচর্চায় মানুষের সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে মনস্তত্ত্বের প্রভাবকে স্বীকার করে নেওয়া হচ্ছে । আচরণবাদী অর্থনীতি (behavioural economics) বলে অর্থনীতির একটি ধারাই তৈরী হয়েছে যার মূল বিষয় হল, তত্ত্ব ও তথ্যের মাধ্যমে যুক্তিসঙ্গত চয়নের কাঠামোর বাস্তবমুখী পরিমার্জন করা ।[4]

মূলধারার অর্থনীতিতে যুক্তিসঙ্গত চয়নের কাঠামোতে আরেকটা দিক থেকে কিছু পরিবর্তন এসেছে, যার মূলে আছে এই ধারণা যে কোন ব্যক্তি তো আর সমাজ বা পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন নয় তাই পরিবারের মধ্যে এবং তার বাইরে বৃহত্তর অর্থনৈতিক পরিসরে, এখন ব্যক্তির সিদ্ধান্তকে বিমূর্তভাবে বিশ্লেষণ করা যায়না, তার সামাজিক পরিচয় (identity) সেখানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে । এর অনেক দিক আছে, যেমন, লিঙ্গ, প্রজন্ম, জাতপাত, বা সামাজিক মর্যাদা, এবং এদের যেকোনো রকমের সমন্বয় । এর ফলে সবার সামনে সিদ্ধান্ত নেবার সময়ে সম্ভাব্য বিকল্পগুলো এক থাকেনা ।

কিন্তু, তথ্যের অসম্পূর্ণতা, সিদ্ধান্ত নেবার প্রক্রিয়ায় মনস্তত্ত্বের প্রভাব এবং সামাজিক পরিচয়ের ভূমিকা, তিনটি বিষয়ই এত দীর্ঘপরিসর এবং গভীর যে তার যথাযথ আলোচনার জন্য একটি গোটা লেখা বরাদ্দ করাই ভাল। এই লেখায় আমরা ধরে নেব, সবার কাছে সমস্ত তথ্য রয়েছে, সবাই সেই তথ্যের সম্পূর্ণ অর্থোদ্ধারে সমর্থ, এবং সিদ্ধান্ত নেবার সময় সমস্ত রকম পরিণাম নিয়ে যথেষ্ট ভাবনা চিন্তা করেই নেয়, এবং সামাজিক পরিচয়ের কোন ভূমিকা নেই । সোজা কথায় বলতে গেলে, সবাই প্রাপ্তবয়স্ক, সম্পূর্ণভাবে অবহিত, এবং নিজের ভালোমন্দ নিজেই সবচেয়ে ভালো বোঝে । তাই আমাদের আলোচনার পরিসরের মধ্যে দুজন প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের মধ্যে স্বেচ্ছা বিনিময়ের অধিকারের হস্তক্ষেপ করার পক্ষে যুক্তি খাড়া করতে গেলে তা তাদের সিদ্ধান্ত নেবার প্রক্রিয়ার মধ্যে পাওয়া যাবেনা, খুঁজতে হবে তার বাইরে । সেটা তাদের সম্পর্কের মধ্যে হতে পারে, বা সেটার সাথে বৃহত্তর সমাজের পারস্পরিক অভিঘাতে হতে পারে ।

বাজারের সমর্থকরা বলে থাকেন, বাজার কাউকে জোর করে না। কেউ স্বেচ্ছায় বাজারে যোগ দিতে পারে, আবার কেউ স্বেচ্ছায় সরে থাকতে পারে সেই বাজার থেকে। মানুষ যখন নিজের ভালমন্দ বিবেচনা করে, ব্যয় - লাভের হিসেব কষে নিয়ে তবেই কোনও সিদ্ধান্ত করে, কাজেই ধরে নেওয়া যায়, যিনি বাজারে যোগ দেওয়ার সিদ্ধান্ত করছেন, তিনি তাতেই ভাল থাকছেন আর যিনি বাজার থেকে দূরে থাকার সিদ্ধান্ত করছেন, তিনি ভাল থাকছেন বাজার থেকে দূরে তাঁর নিজস্ব কোণে। অর্থাৎ, বাজার আসার আগে সবাই যতটুকু ভাল থাকছিলেন, বাজার আসার পরে কেউ কেউ ততটুকুই ভাল থাকছেন (যাঁরা বাজারে যোগ দিলেন না, তাঁরা), আর কেউ কেউ

বাজারে যোগ দিয়ে আগের চেয়ে ভাল থাকছেন। মোটমাট, সবাইকে যোগ করলে সমাজের ভাল থাকার পরিমাণ আগের তুলনায় বাড়ছে, এবং সেটা বাড়ছে প্রত্যেকের ব্যক্তিস্বাধীনতা বজায় রেখেই। utilitarian বা তৃপ্তিযোগবাদীরা বলবেন, এই তো চাই!

তা হলে বাজারের বিরোধীদের মূল যুক্তিগুলো কী?

প্রথমত, যাকে চয়নের স্বাধীনতা বলে মনে হচ্ছে, তা অনেক সময়েই আসলে ঘোরতর বাধ্যবাধকতা। সামাজিক চাপ, অর্থনৈতিক চাপ, শিক্ষার অভাব, বিকল্প পেশার অভাব— সব মিলিয়ে মানুষ অনেক কাজ করতে, অনেক ধরনের সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হন । অর্থাৎ, এই ধরনের চয়ন অসম বিনিময় বা শোষণের (exploitation) উদাহরণ । দ্বিতীয়ত, কিছু ক্ষেত্রে দুজন প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের মধ্যে স্বেচ্ছা বিনিময় সমাজে অন্যদের ওপর দূষণের মত প্রত্যক্ষভাবে না হলেও, পরোক্ষ প্রভাব ফেলতে পারে । যেমন, কিছু ধরনের পেশা আইনি হলে (যেমন, দেহব্যবসা) অন্য ধরনের পেশায় তার প্রভাব পড়তে পারে বা, বৃহত্তর সমাজে তার কিছু অভিঘাত পড়তে পারে (যেমন, মূল্যবোধের অবক্ষয়) যা কাম্য নয় । এই যুক্তিটি অতিক্রিয়ার (externality) এবং এর অনেক উদাহরণ এই প্রবন্ধে আমরা আলোচনা করব। তৃতীয়ত, আইন ব্যবস্থার নানা ত্রুটি থাকায়, যা আপাতদৃষ্টিতে স্বেচ্ছা বিনিময়, তার মধ্যে অনেকসময়েই জোরজবরদস্তি (coercion) এবং অপব্যবহারের (abuse) সম্ভাবনা থেকে যায়। চতুর্থত, যেহেতু আমরা প্রথমেই ধরে নিয়েছি সবাই প্রাপ্তবয়স্ক, সম্পূর্ণ ভাবে অবহিত, এবং নিজের ভাল-মন্দ নিজেই সবচেয়ে ভালো বোঝে, তাই অবাধ বিনিময়ের (যেমন, মাদকদ্রব্যের কেনাবেচা) কিছু পরিচিত "এখন করছ, পরে কিন্তু পস্তাবে" বা "নিজের ভালো মন্দ বোঝনা" গোছের আপত্তি আমাদের আলোচনার পরিধির বাইরে ।[5] কিন্তু কিছু উদাহরণ অবশ্য আছে (যেমন, শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বিক্রি করা) যেখানে সিদ্ধান্তগুলো একই সাথে এমনই অপরিবর্তনীয় এবং তাৎপর্যপূর্ণ যে একবার ভুল সিদ্ধান্ত নিলে তার জন্যে সারা জীবন ভুগতে হয় বা, জীবন নিয়েই টানাটানি হতে পারে । আমরা এইসব ক্ষেত্রে স্বেচ্ছা বিনিময়ের অধিকার নিয়ন্ত্রণের কথা আলোচনা করব।

পণ্য হল যা কিছু আজ ব্যক্তিগত

একটা সাম্প্রতিক খবরের গল্প দিয়ে শুরু করি। ইউরোপের একটা নামকরা পোশাকবিপণি প্রাইমার্ক। সস্তায় ফ্যাশনেবল পোশাক বিক্রিতে তার খ্যাতি। ১৯৬৯ সালে আয়ার্ল্যান্ডের ডাবলিন শহরে ব্যবসা আরম্ভ করেছিল দোকানটি, তার পর ক্রমে পৌঁছেছে অস্ট্রিয়া, বেলজিয়াম, ফ্রান্স, জার্মানি, পর্তুগাল, স্পেন, ইংল্যান্ড, হল্যান্ডে। ইংল্যান্ডের এক মহিলা, রেবেকা গালাঘার, প্রাইমার্ক-এর এক দোকান থেকে একটি ফ্লোরাল টপ কিনেছিলেন। সেই পোশাকের ভিতর তিনি এক অপ্রত্যাশিত চিরকুট পেলেন। তাতে লেখা, "আমরা অমানুষিক পরিশ্রম করতে বাধ্য হচ্ছি।"[6] তাঁর টপের ভিতরে, সঙ্গোপনে, সেলাই করা ছিল বার্তাটি। রেবেকা বলেছেন, চিরকুটটা পড়ার পর থেকে তাঁর ভিতরে এক অন্তহীন দোলাচল আরম্ভ হয়েছে। তাঁর পরিধানের সস্তা পোশাক জোগাতে সত্যিই পৃথিবীর অন্য প্রান্তে কাউকে প্রাণান্ত পরিশ্রম করতে হচ্ছে, ভেবে বিবেকের দংশন হচ্ছে তাঁর।

রেবেকার জামাটি কোথায় তৈরি হয়েছিল, আমরা জানি না। হয়তো চিনে, হয়তো ভিয়েতনামে, বা হয়তো বাংলাদেশে, রানা প্লাজায়। তৃতীয় বিশ্বের প্রায় প্রতিটি দেশেই কার্যত এক ভঙ্গিতে তৈরি হয় উন্নত দুনিয়ার জামাকাপড়, মোবাইল ফোন, কম্পিউটার থেকে খেলনা।[7,8,9] দিনে ১৮ ঘণ্টা পরিশ্রম করে, কারখানার বেসমেন্টে একটা দশ ফুট বাই দশ ফুট ঘরে পনেরো জন ঠাসাঠাসি করে রাত কাটিয়ে চিনের বিভিন্ন কারখানায় যাঁরা তৈরি করছেন আইপ্যাড, তাঁদের মাসের মাইনে, সমস্ত ওভারটাইম সমেত, এতটাই কম যে দু'মাসের মাইনে যোগ করলেও একটা আইপ্যাড কেনা সম্ভব হয় না। কাজের সময় নিজেদের মধ্যে কথা বলা বারণ, দিনে বার তিনেকের বেশি বাথরুমে যাওয়ারও উপায় নেই। ম্যানেজারের রক্তচক্ষু উপেক্ষা করা শ্রমিকদের সাধ্যাতীত। যেহেতু এই কারখানাগুলির বেশির ভাগ কর্মীই মহিলা, তাই নিয়ম করে প্রেগন্যান্সি টেস্ট হয়।[10] এখানে চাকরি করতে হলে গর্ভধারণ নিষিদ্ধ। মাতৃত্বের জন্য কোনও রকম সুযোগসুবিধা দিতে কারখানা রাজি নয়।

তবুও, এই কারখানাগুলিতে কাজ করতেই হত্যে দিয়ে পড়ে থাকেন বহু, বহু মানুষ। কারখানায় যত কর্মী প্রয়োজন, তার চেয়ে ঢের বেশি। কেন, সেই কারণ বুঝতে অর্থনীতিবিদ হওয়ার প্রয়োজন নেই। বাংলাদেশের যে

মেয়েরা গারমেন্টস কারখানায় কাজ করেন— সেখানকার অমানবিক কাজের পরিবেশ সত্ত্বেও— তাঁদের কাছে সেটাই সেরা বিকল্প। প্রথম বিশ্বের তুলনায় নামমাত্র বেতনও তাঁদের দেশের প্রেক্ষিতে অনেকখানি। আর কোনও কাজ করে এই পরিমাণ উপার্জন করা তাঁদের পক্ষে অসম্ভব।

বাজার অর্থনীতির যুক্তি বলবে, কারখানায় কাজ করতে চেয়ে লাইনে দাঁড়িয়ে থাকা প্রত্যেকটি মানুষ ব্যয় - লাভের হিসেব কষে তবেই এই কাজ করতে এসেছেন। অন্যত্র কাজ করলে সে কাজের সঙ্গে বেতনের যা তুল্যমূল্য হিসেব, তার তুলনায় গারমেন্টস কারখানায় লাভ বেশি বলেই না তাঁরা কাজ করতে এসেছেন এখানে। কাজেই, এই বাজার এসে বাংলাদেশের মেয়েদের বরং আগের তুলনায় ভাল রাখছে। আর, রানা প্লাজায় দুর্ঘটনার মতো উদাহরণের প্রসঙ্গ যদি টানেন, দুর্ঘটনা তো ঘটতেই পারে। ভবিষ্যতে যাতে এমন না ঘটে, তার জন্য সতর্ক হওয়া অবশ্যই প্রয়োজন, কিন্তু তার বেশি কথার দরকার কী?

আরো কতগুলো অস্বস্তিকর উদাহরণ দিই ।

"সারোগেট মাদার"-এর একটা মস্ত বড় বাজার হল ভারত। আমাদের দেশের অনেক মহিলা, প্রধানত গ্রামাঞ্চলের দরিদ্র শ্রেণির মহিলা, অর্থের বিনিময়ে কৃত্রিম গর্ভসঞ্চারের মাধ্যমে গর্ভে বহন করেন উন্নত বিশ্বের কোনও এক পুরুষের ঔরসজাত ভ্রূণ। বাচ্চার জন্মের পর তাকে তুলে দেন সেই দম্পতির হাতে। বিনিময়ে পান পাঁচ থেকে সাত হাজার ডলার। তাঁদের প্রায় দশ বছরের রোজগারের সমান।[11] এই পেশায় কোনও নিষেধাজ্ঞা জারি করেনি কোনও দেশের সরকার— ভারতেরও নয়, উন্নত দুনিয়ারও নয়। কাজেই, ধরে নেওয়া যায়, তাতে রাষ্ট্রের সম্মতি রয়েছে। অর্থাৎ, রাষ্ট্র মেনে নিচ্ছে বাজারের যুক্তি— ক্রেতা এবং বিক্রেতার সম্মতি থাকলেই বিনিময় সম্ভব, তার জন্য নৈতিকতার প্রশ্নের মুখাপেক্ষি হওয়ার প্রয়োজন নেই।

এমন ওষুধ যার পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া অথবা প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধে গবেষকরা নিশ্চিত নন সেগুলো মানুষের ওপর পরীক্ষা করার একটা বাজার আছে । কত টাকা পেলে এক জন রাজি হবেন নিজের ওপর নতুন তৈরি হওয়া ওষুধের গুণাবলি পরীক্ষা করে দেখতে দিতে? বাজারের যুক্তি বলবে, নিশ্চয়ই এমন কোনও দাম সম্ভব, যে দামের বি নিময়ে মানুষ নিজেকে এই ঝুঁকির সম্মুখীন করতে রাজি হবে। এমন অনেকেই আছেন, যাঁরা নিজের শরীরের ওপর

বিভিন্ন ওষুধের পরীক্ষামূলক ব্যবহার করতে রাজি হন, অবশ্যই টাকার বিনিময়ে । মার্কিন ওষুধ গবেষণার বাজার কত দাম স্থির করেছে? ডায়রিয়ার ওষুধের প্রতি ট্রায়ালে ৩০০০ ডলার, হাঁপানির ওষুধ ৫০০০ ডলার, সানস্ক্রিন লোশন প্রতি বর্গ ইঞ্চিতে ৬৫ ডলার... এই রকম সব দাম।[12],[13] এমন আরও অনেক বিনিময়ের কথা উল্লেখ করেছেন মাইকেল স্যান্ডেল, তাঁর সাম্প্রতিক একটি বই-এ, যার নাম-ই হলো "টাকা দিয়ে যা কেনা যায়না" ।[14] তাঁদের শরীরকেও পণ্যে পরিণত করা হচ্ছে, এবং তার দাম স্থির করা হচ্ছে। এই পেশাটিও আইনি। এই পেশায় রাষ্ট্রের আপত্তি নেই। এ ক্ষেত্রেও রাষ্ট্রের ছাড়পত্র দাঁড়িয়ে আছে উভয় পক্ষের সম্মতির ওপর।

যে উদাহরণ গুলো দিলাম, সেগুলো আমাদের কাছে নৈতিকভাবে অপ্রীতিকর ঠেকলেও, আইনের দিক থেকে এগুলি বিধিসম্মত । এবার আসা যাক এমন কিছু উদাহরণে, যেগুলি নৈতিক ভাবে অপ্রীতিকর এবং আইনের দিক থেকেও অবৈধ ।

আমাদের শরীরে এমন বহু অঙ্গ রয়েছে, যার খানিকটা না থাকলেও আমাদের চলে যাবে। কিডনিই যেমন দুটো রয়েছে, যেখানে একটা কিডনিতেই সুস্থ ভাবে বেঁচে থাকা সম্ভব। লিভারের খানিকটা কেটে অন্য কাউকে দিয়ে দিলেও বেঁচে থাকতে সমস্যা নেই। এমনকী, একটা ফুসফুস, একটা চোখ, অন্ত্রের খানিকটা অংশ, সবই দান বা বিক্রি করে দেওয়া যায়। কিন্তু, বেশির ভাগ অপারেশনই বেশ জটিল। তুলনায়, একটা কিডনি বাদ দেওয়া সহজ। কাজেই, কেউ চাইলে নিজের একটা কিডনি বেচে দিতেই পারেন। যেমন, চিনের এক যুবক নিজের কিডনি বিক্রি করে দিয়েছিলেন ২০,০০০ ইউয়ানে। সেই টাকায় একটা আইপ্যাড কিনেছিলেন তিনি।[15] কিন্তু, দুনিয়ার প্রায় সব দেশেই কিডনিসহ শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বিক্রি করা নিষিদ্ধ।আজ কোনও আধুনিক রাষ্ট্র যার কথা ভাবতেও পারে না, সেই ক্রীতদাস প্রথা কিন্তু প্রাচীন ইতিহাস নয়। মাত্র ৬৪ বছর আগে, ১৯৪৮ সালে রাষ্ট্রপুঞ্জকে আনুষ্ঠানিক ভাবে ঘোষণা করতে হয়েছিল, "অতঃপর কোনও মানুষকে ক্রীতদাস করে রাখা যাবে না। সব রকম ক্রীতদাস প্রথা নিষিদ্ধ করা হল।"[16] তার পরেও বহু দেশে চোরাগোপ্তা, অথবা রীতিমত প্রকাশ্যে, ক্রীতদাস প্রথা বহাল থেকেছে। এখন ক্রীতদাস প্রথা দাসের ব্যক্তি-স্বাধীনতার অধিকারকে চূড়ান্তভাবে লঙ্ঘন তাই, উদারবাদী যুক্তিতে একে সমর্থন করার প্রশ্ন ওঠে না । কিন্তু স্বেচ্ছা দাসত্ব? অভাবের বা দেনার দায়ে কেউ যদি আর এক জনের

কাছে নিঃশর্ত ভাবে নিজেকে বিক্রী করে দেয়, যে অর্থ তার পরিবার বা প্রিয়জন পায়, সেটা আইনত অবৈধ করার যুক্তি কি? দাসত্ব বিষয়টি নৈতিক ভাবে অত্যন্ত আপত্তিকর, তাই প্রশ্নটা অদ্ভূত ঠেকতে পারে। কিন্তু অতি-উদারবাদী (libertarian) আর উদার-বাদী (liberal) বা সমতাবাদী (egalitarian) দের মধ্যে বিতর্কে এই উদাহরণটা অনেক সময়েই উঠে আসে কারণ অবাধ-বাণিজ্যের এবং ব্যক্তিগত স্বাধীনতার যুক্তি ঠেলে কত দূর নিয়ে যাওয়া যায়, এটা তার একটা চরম নমুনা।[17] অর্থাৎ, মুক্ত বাণিজ্যের অধিকারের মধ্যে নিজের অধিকার বিক্রী করে দেবার অধিকারও পড়ে?

সরকারে দরকার

বাজারের যুক্তি হলো, কেউ স্বেচ্ছায় কিছু করলে তাতে তার আয়ত্তের মধ্যে অন্য বিকল্পগুলোর চেয়ে ভালো হবে বলেই করে। কেউ যখন আপাতদৃষ্টিতে কোন অপ্রীতিকর বা বিপজ্জনক পেশায় যোগ দেন, তাঁরা নিশ্চয়ই অন্য পেশার সাথে তুলনা করেই এই সিদ্ধান্ত নেন। তাই, স্বেচ্ছা বিনিময় নিয়ন্ত্রণ করলে (যার চরম উদাহরণ হল একেবারে বেআইনি ঘোষণা করে দেওয়া) মানুষের ভালো করতে গিয়ে মন্দই হবে। বলে রাখা ভালো যে দেহব্যবসা বা শিশু শ্রমের ক্ষেত্রে অনেক সময়েই শুরুতে থাকে জোরজবরদস্তি করে বা ঠকিয়ে পাচার করে দেওয়ার নির্মম গল্প, আর তাই এই "স্বেচ্ছায় যোগ দেওয়ার" শর্তটি পালিত হয় না। এই ধরনের তথাকথিত বিনিময় দাঁড়িয়ে আছে ব্যক্তিস্বাধীনতার চূড়ান্ত লঙ্ঘনের ওপরে, তাই অতি-উদারপন্থীরাও এগুলোর সমর্থনে কিছু বলবেন বলে আশঙ্কা হয় না। এই উদারহরণগুলোকে আমরা এই আলোচনার পরিধির বাইরে রাখছি।

আগের অংশে যে উদাহরণগুলো দেখলাম তাদের মধ্যে চরিত্রগত কতগুলো মিল আছে। প্রত্যেক ক্ষেত্রেই আপাতদৃষ্টিতে স্বেচ্ছা-বিনিময় হলেও এদের পেছনে অসাম্যের এবং দারিদ্রের একটা বড় ভূমিকা আছে - মানুষ স্বেচ্ছায় যা করে আর বাধ্য হয়ে যা করে, তার মধ্যে তো তফাত আছে। দ্বিতীয়ত, প্রত্যেকটি ক্ষেত্রেই আমাদের

নৈতিক বোধ অল্প-বিস্তর ধাক্কা খায়, মনে হয় মানুষের শরীরের-মনের-সম্পর্কের মর্যাদার অসম্মান হচ্ছে । তৃতীয়ত, এও আশঙ্কা হতে পারে যে এই ধরনের বাজারের প্রসার হলে বৃহত্তর সমাজের ওপর খারাপ প্রভাব পড়তে বাধ্য । চতুর্থত, আইন এবং প্রশাসন ব্যবস্থার মধ্যে যেহেতু নানা ত্রুটি থাকে, তাই এই ধরনের বিনিময় আইনি হলে সেই আইনের অপব্যবহার হবার সম্ভাবনা খুব বেশি, আর কিছু ক্ষেত্রে তার মারাত্মক ফল হতে পারে, যেমন মানুষের জীবন ও স্বাস্থ্য বিপন্ন হয়ে উঠতে পারে । সংক্ষেপে বলতে গেলে, স্বেচ্ছা-বিনিময় নিয়ন্ত্রণ করার স্বপক্ষে মূল যুক্তিগুলো হল, অসাম্য, নৈতিক আপত্তি, অতিক্রিয়ার আশঙ্কা, জীবন ও স্বাস্থ্য বিপন্ন হবার ঝুঁকি, এবং আইনের অপব্যবহার ।

উদাহরণগুলোর মধ্যে চরিত্রগত কিছু মিল থাকা সত্বেও এই বিনিময় গুলির কোনওটা আইনি আবার কোনওটা বেআইনি । তার মানে কোন ক্ষেত্রে স্বেচ্ছা-বিনিময় অবাধে করা যাবে, কোন ক্ষেত্রে তা নিয়ন্ত্রণ করা উচিত, এবং কোন ক্ষেত্রে তাকে বেআইনি ঘোষনা করা উচিত, সে বিষয়ে কোনও প্রতিষ্ঠিত এবং সর্বজনমান্য নীতি নেই। সেই নীতি কী হতে পারে, কোন সীমারেখায় এসে বাজারের অবাধ বিনিয়োগে রাশ টানতে হবে, তার পেছনের যুক্তিগুলো পরীক্ষা করে দেখা প্রয়োজন। আরো নির্দিষ্ট করে বলতে গেলে, আমাদের এমন কতগুলো মাপকাঠি বার করতে হবে, যে ডাক্তারি পরীক্ষার মত, তাদের মাত্রা একক ভাবে বা একে অন্যের সমন্বয়ে কোন পর্যায় অতিক্রম করলে স্বাস্থ্যহানি হবে, সেটা ঠিক করতে হবে । আইনের কথা যখনই উঠছে, বাজার ব্যবস্থা এবং মানুষের মধ্যে ঢুকে পড়ছে একটি তৃতীয় চরিত্র - রাষ্ট্র । রাষ্ট্র মানে সমাজতান্ত্রিক দুনিয়ার সর্বনিয়ন্ত্রক রাষ্ট্র নয়, বরং আধুনিক, উদার রাষ্ট্র। যার কাজ, তার আয়ত্তাধীন ভৌগোলিক পরিসরে আইনের শাসন (rule of law) বজায় রাখা। বাজার কত দূর যেতে পারে, কোথায় তাকে থমকে দাঁড়াতে হবে, কোথায় **কীভাবে** স্বেচ্ছা-বিনিময়কে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে তা ঠিক করা ।

স্বেচ্ছা বিনিময় নিয়ে উল্লিখিত প্রথম আপত্তিটি, অর্থাৎ অসাম্য, সুপরিচিত। বহু বিনিময়ের ক্ষেত্রেই দেখা যায়, এক পক্ষের তীব্র অর্থনৈতিক সংকট তাকে অসম্ভব কিছু বিনিময়ের ক্ষেত্রে সম্মতি জানাতে বাধ্য করে। মানুষ লাভ-ক্ষতির হিসেব কষে সবচেয়ে লাভজনক বিকল্প হিসেবেই গারমেন্টস কারখানাগুলিকে বা কিডনি বিক্রি করা বেছে নিচ্ছে, এটা নেহাত কুযুক্তি। মানুষ বাছছে ঠিকই, কিন্তু একে চয়নের স্বাধীনতা বলার কোনও কারণ নেই, এটা তাঁদের বাধ্যবাধকতা। বাকি বিকল্পগুলি এমনই দারিদ্রের, এমনই মারাত্মক যে সেগুলিকে বেছে নেওয়া আর স্বেচ্ছামৃত্যু বরণ করার মধ্যে খুব পার্থক্য নেই।

কিন্তু, বিক্রির পিছনে কোনও বাধ্যবাধকতা আছে, অতএব সেই বিনিময়কে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হোক, এই যুক্তি গোলমেলে। বহু মানুষ নেহাত দায়ে পড়ে জমি বেচতে বাধ্য হন। কিন্তু, সেই দায়ের দোহাই দিয়ে জমি কেনা বেচা তো বন্ধ করে দেওয়া যায় না। শুধু তাই নয়, এই পেশাগুলো বা এই ধরনের বিনিময় যদি বেআইনি করেও দেওয়া হয়, এবং তর্কের খাতিরে ধরে নেওয়া হয় সেই আইন বলবত হবে, তাহলে ওই মানুষেরা কী করবেন? ভেবে দেখতে হবে এই ধরনের বিনিময় উপসর্গ না মূল রোগ? না কি আসল সমস্যা দারিদ্র এবং বঞ্চনা, বাজার যাকে দৃষ্টিকটু ভাবে সবার চোখের সামনে নিয়ে আসছে মাত্র। তাই এই পেশা বেআইনি করে আমাদের অস্বস্তি প্রশমিত হতে পারে, কিন্তু সেই মানুষগুলো কি তখন "ভাল" কোন পেশায় নিয়োজিত হয়ে সুখে থাকবেন? যে দেশে অভাবী মানুষের সংখ্যা অগণ্য, সেখানে উত্তরটা যে না, সেটা আমরা জানি।

তাই আমাদের আপাত-সহানুভূতি আসলে "জানি না বাবা, তবে আমার চোখের সামনে যেন এসব না হয়" ধরনের স্বার্থপরতা কি না, সেটা ভেবে দেখা দরকার। অন্য ভাবে বলতে গেলে, এখানে বাজারি বিনিময় মূল অসুখ নয়, তাই এর বিহিত করতে গেলে বাজারি বিনিময় নিয়ন্ত্রিত বা বেআইনি ঘোষণা করতে গেলে হিতে বিপরীত হতে পারে। এ ক্ষেত্রে কর্তব্য ভিন্ন। যে চরম দারিদ্র মানুষকে এমন সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য করে, তার প্রতিকার করা। মানুষের জন্য সামাজিক নিরাপত্তার বন্দোবস্ত করা, সেই মানুষগুলোর যাতে বিকল্প কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হয়, তার কথা ভাবা।

এ বার আসি স্বেচ্ছা বিনিময় নিয়ে দ্বিতীয় আপত্তিটিতে, অর্থাৎ, অনেক ধরনের বিনিময়, তা অভাবের তাড়নায় হোক আর না হোক, আমাদের নীতিবোধকে আঘাত করে। দেহব্যবসা নিয়ে নৈতিক অস্বস্তি সুপরিচিত। আধুনিক প্রযুক্তি আমাদের শরীরের অঙ্গ বা রক্ত বিক্রি করা, কিম্বা নিজের জঠর ভাড়া দেওয়া এবং এরকম অনেক নৈতিক ভাবে অস্বস্তিকর বিনিময়ের মুখোমুখি করেছে । এখানে একটা কথা পরিষ্কার করে নেওয়া ভালো । আমাদের উদাহরণগুলো থেকে মনে হতে পারে অনেক ক্ষেত্রেই একপক্ষ এমন কোনও জিনিস বিনিময় করতে বাধ্য হচ্ছে, টাকার অঙ্কে যার দাম নির্ধারণ করা সম্ভব নয়। নিজের গর্ভ, কিডনি বা চামড়া, অথবা নিজের অস্তিত্ব, কোনওটারই দাম বাজারের চাহিদা-জোগানের নিয়ম মেনে স্থির হচ্ছে ভাবলে অস্বস্তি হতে বাধ্য । কিন্তু যা উচিত বা শোভন আর যা বাস্তব, তাদের মধ্যে তো জীবনে প্রায় সব ক্ষেত্রেই ফারাক থাকে, এই ক্ষেত্রেও আছে । দার্শনিক ভাবে ভাবলে মনে হতেই পারে, প্রকৃতি মাতার দরাজ হাতে দেওয়া উপহার অর্থাৎ প্রাকৃতিক সম্পদের গায়েও কি দামের স্টিকার বসানো যায়? যায়, এবং অহরহ হচ্ছেও - পশু, পাখি, ফুল, ফল, বৃক্ষ, মাটি, খনিজ পদার্থ সবই তো কেনাবেচা হয় । আসলে বাজারের যুক্তি খুব সরল - যার জন্যেই কেউ কোন দাম দিতে রাজি, তাই পণ্য, এবং চাহিদা আর যোগানের ওপর তার দাম নির্ভর করবে । এই অর্থে বাজার সম্পূর্ণ নীতি-নিরপেক্ষ (amoral)। বাজারের দাম (price) আর মূল্য (value) সম্পূর্ণ দুটো আলাদা জিনিস - এখানে অস্কার ওয়াইল্ডের সেই বিখ্যাত উক্তি মনে পড়ে যেতে পারে, শুভনাস্তিক (cynic) হল সে, যে সব কিছুর দাম জানে কিন্তু কোনো কিছুরই মূল্য জানেনা!

কিন্তু তাহলেও, কিছু ক্ষেত্রে বাজারী বিনিময় আমাদের নীতিবোধকে বেশি ধাক্কা মারে । এই ক্ষেত্রে সামাজিক নিয়ন্ত্রণের স্বপক্ষে কোন যুক্তি আছে কি? একটা উদাহরণ দিই । ইয়োরোপের কিছু দেশে “বামন ছোঁড়াছুঁড়ি” বলে অদ্ভূত একটা খেলা জনপ্রিয়, যাতে গদি-লাগানো দেয়ালে বিশেষ পোশাক পরা খর্বাকৃতি মানুষদের ধরে তুলে ছুঁড়ে ফেলে তারা আটকে গেল কিনা দেখা এক মহা আমোদের ক্রীড়া বলে পরিগণিত হয় । তবে ফ্রান্সে কিছু দিন তা বেআইনি ঘোষিত হয়েছে। তাতে আবার এক জন খর্বাকৃতি মানুষ এই আইনের বিরুদ্ধে আদালতে মামলা করেছেন, তাঁর সৎপথে জীবিকা অর্জন করার অধিকার খর্ব করার বিরুদ্ধে।[19] এই খেলাটা নিয়ে আমাদের

অস্বস্তিটার মূল সূত্র হল, কোথাও এতে মানবিকতার অবমাননা হচ্ছে, অমর্যাদা করা হচ্ছে । এখন সর্বজনসমক্ষে সেটা হলে, তার অতিক্রিয়া নিয়ে নালিশ করাই যেতে পারে । সেই রকম কারোর স্বাস্থ্য বা প্রাণহানির আশংকা থাকলে তা নিবারণের জন্যে নিশ্চয়ই উপযুক্ত আইন থাকা দরকার ।

কিন্তু কোন আবদ্ধ আঙ্গিনায় দর্শক এবং এই ক্রীড়ায় অংশগ্রহণকারীদের সম্মতি থাকলে, আমার আপনার ভাল লাগে না বলে এটা বেআইনি করার পক্ষে যুক্তি কি? তাহলে তো কত বই, গান, সিনেমাও বেআইনি করতে হয় । কারও কখনো কুরুচিকর বা আপত্তিকর লাগবে না এমন বই বা সিনেমা কটাই বা আছে? এখানে বাজারে দুপক্ষের সম্মতিসহ বিনিময় এবং বাকস্বাধীনতার সাথে একটা মিল আছে । ভয়ানক জোরে (বা, মাইক চালিয়ে) কথা বলা নিয়ে আপত্তি করা যেতে পারে, সেই রকম কাউকে হত্যা করার পরিকল্পনা বা বন্ধ সভাঘরে মিথ্যে করে "আগুন লেগেছে" বলে চিৎকার করা অবশ্যই অবাধ বাকস্বাধীনতার অংশ হতে পারে না । কিন্তু তা ছাড়া, অন্যের ওপর প্রত্যক্ষ প্রভাব না পড়লে এবং কারোর জীবন বিপন্ন না হলে "কুরুচিকর" বা "মূল্যবোধের অবক্ষয়" বলে নানা লেনদেন বেআইনি করার পথ দিয়ে না হাঁটাই ভালো, সেই পথের শেষে ব্যক্তিস্বাধীনতা বলে কিছু আর বাকি থাকবে না । তাই উদারবাদী-দের পরিচিত "ও, ছবি-টা অশ্লীল? তাহলে দয়া করে আপনি দেখবেননা" এই যুক্তির সাথে দ্বিমত হওয়া মুশকিল ।

তৃতীয় আপত্তি অতিক্রিয়া নিয়ে। আগের উদাহরণের জের টেনে বলা যায়, কোন বিতর্কিত ছবি (সে রাজনৈতিক কারণে বা অশ্লীলতার দায়েই হোক) সতর্কতাবানী ছাড়া অবাধে দেখানো হলে বা চারিদিকে তার বিজ্ঞাপন দিলে, অতিক্রিয়ার যুক্তি খাটে, এবং সেক্ষেত্রে সামাজিক নিয়ন্ত্রণের যুক্তি টা খাটে । কিন্তু, এই যুক্তির প্রয়োগ করার সময় সাবধান হতে হবে - কেউ তার নিজের বাড়িতে এইরকম ছবি দেখছে কল্পনা করেও যদি আমার অস্বস্তি হয়, তাহলে কিছু করার নেই । বহু ক্ষেত্রে অতিক্রিয়ার প্রভাব গুরুত্বপূর্ন, এবং বিতর্কের ঊর্ধে, যেমন পরিবেশ দূষণ। কিন্তু অতিক্রিয়ার দোহাই দিয়ে কিছু বিনিময়ের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করার প্রস্তাব এলে তার উল্টো দিক থেকে প্রশ্ন উঠবে, প্রায় সব কাজেরই তো অতিক্রিয়া রয়েছে (যেমন, কিছু বিনিময় আমাদের কুরুচিকর লাগা)। তাই আবার প্রশ্ন হল কোথায় সীমারেখা টানা হবে? কতগুলো উদাহরণ নিয়ে দেখা

যাক। এক প্রাপ্তবয়স্ক মানুষ যদি স্বেচ্ছায় মাদক বিক্রি করতে চান, এবং আর এক জন যদি স্বেচ্ছায় সেই মাদক কিনে নেশা করতে চান, তবে অতি-উদারবাদীরা বলবেন, সেই বিনিময়ে বাধা দেওয়ার কোনও যুক্তিসঙ্গত কারণ নেই। কিন্তু সত্যিই কি নেই? পারিপার্শ্বিকের, বিশেষত বন্ধুবান্ধবের, যে প্রভাব আমাদের ওপর পড়ে, তার কথা মাথায় রাখলে বলতে হয়, মাদক কেনাবেচা আইনি হলে খুব অল্প সময়ের মধ্যেই মাদকাসক্তি মহামারীর আকার ধারণ করবে। এবং, যাঁরা মাদকাসক্ত নন, বা মাদক কেনাবেচার বিনিময়ে যাঁরা কোনও ভাবেই যুক্ত নন, এটা তাঁদেরও প্রভাবিত করবে, কারণ এক দিকে সেই মহামারী প্রতিরোধে যে স্বাস্থ্যব্যয় হবে, তা আসবে রাজকোষ থেকে, মানে প্রত্যেকের টাকা থেকে, আর অন্য দিকে, সেই মহামারীতে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকিও বাড়বে। কাজেই, মাদক কেনাবেচাকে ছাড়পত্র দেওযার আগে তার অতিক্রিয়ার কথা ভাবতে হবে বইকি।

কিন্তু, অতিক্রিয়া আছে, এটাই কোনও বিনিময়কে নিষিদ্ধ করার ক্ষেত্রে যথেষ্ট যুক্তি কি না, সেটাও ভেবে দেখার মতো। মাদকের উদাহরণে যেমন বিপুল স্বাস্থ্যব্যয় এবং জীবন ও স্বাস্থ্য নিয়ে ঝুঁকি এই বিনিময় অবাধ করার বিরুদ্ধে একটা বড় যুক্তি। আরেকটা উদাহরণ নেওয়া যাক। ধরে নেওয়া যাক, দুজন মানুষ এমন এক কারখানায় চাকরি করেন, যেখানে চাকরির চরিত্রে খানিক ঝুঁকি আছে। সব চাকরিতেই শারীরিক ক্ষতির অল্পবিস্তর ঝুঁকি থাকে বটে, কিন্তু আলোচনার সুবিধার জন্য ধরে নেওয়া যাক, তাঁরা চাকরি করেন একটা খনিতে বা রাসায়নিক কারখানায় বা নির্মান শিল্পে। ধরে নেওয়া যেতেই পারে, স্বাস্থ্যের ক্ষতি কেউই পছন্দ করেন না, আবার এটাও ধরে নেওয়া যেতে পারে যে সেই ক্ষতির ঝুঁকি নিয়ে সবাই সমান রকম চিন্তিত নন। ধরে নেওয়া যাক এই দুজন শ্রমিক সব দিক থেকেই সমান, কিন্তু ঝুঁকির প্রতি মনোভাব তাঁদের এক রকম নয়। তাঁদের মধ্যে এক জন ঝুঁকি নিতে ভয় পান না, কিন্তু অপর জনের ঝুঁকিতে প্রবল আপত্তি। ধরা যাক, সরকার একটা নতুন আইন করে দিল, কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তার আর কোনও ধরাবাঁধা মান থাকবে না। যে সংস্থার যেমন মনে হবে, তারা ততটুকু নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতে পারবে। তাতে কারোর পোষালে সে থাকবে, না হলে অন্যত্র চাকরি খুঁজে নেবে। মুক্তবাজারপন্থীরা বলবেন, এরকমই হওয়া উচিত। যাঁরা ঝুঁকি নিতে প্রস্তুত তাদের মাইনে বাড়বে, আবার

প্রতিযোগিতার ফলে এমন কারখানাও থাকবে যারা সাবধানী মনোভাবের শ্রমিকদের নিয়োগ করবে - সবাই ভালো থাকবে।

কিন্তু, এই সম্ভাবনাটি সত্য হওয়ার একটা শর্ত আছে। সেটা হল, শ্রমিকের জন্য চাহিদা প্রবল হতে হবে। নব্যধ্রুপদী অর্থনীতিতে ধরেই নেওয়া হয়, যত লোক চাকরি করতে চান, তাঁদের সবার জন্যই চাকরি আছে। অর্থাৎ , বাজারে শ্রমিকের জন্য প্রবল চাহিদা রয়েছে। কিন্তু বাস্তব অভিজ্ঞতা, বিশেষত ভারতের মতো তৃতীয় বিশ্বের দেশে, বলবে, এখানে অনেক শ্রমিক আর চাকরি স্বল্প। ফলে, এমন জায়গায় কম নিরাপত্তার বিনিময়ে বেশি মাইনে নিতে আগ্রহী নন যে শ্রমিকরা, হয় তাঁদের মাইনে কমে যাবে, নয়তো চাকরি পেতে অসুবিধে হবে, আর তা না হলে তাঁরা বাধ্য হবেন অনিচ্ছা সত্ত্বেও কম নিরাপত্তার চাকরি করতে।

কিন্তু এই অতিক্রিয়ার কথা মাথায় রেখে কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তার ন্যূনতম মান সরকারের বেঁধে দেওয়া উচিত? কৌশিক বসু সাম্প্রতিক একটি প্রবন্ধে এইরকম কতগুলি উদাহরণ ব্যবহার করে এই যুক্তিটি পেশ করেছেন। আমরা মনে করি এইরকম নিয়মবিধি থাকা উচিত।[20] কিন্তু তার জন্যে অন্য যুক্তি থাকলেও (সেই প্রসঙ্গে আমরা পরে আসছি) এই যুক্তিটি যথেষ্ট জোরদার নয়। তার কারণ বাজার অর্থনীতিতে অনেক কারণেই দাম বা মজুরি প্রভাবিত হতে পারে, সেগুলো সব আইন করে নিষেধ করে দেওয়া যায় না। যেমন, যখনই উদ্ভাবনের ফলে নতুন কোন পণ্য বা পরিষেবা বাজারে আসে তখন তার বিকল্পগুলির বাজার ধাক্কা খায় (যেমন, কম্পিউটার আসার ফলে টাইপরাইটার), কিন্তু তাই বলে তো উদ্ভাবন বন্ধ করে দেওয়া যায় না। অসাম্য এবং দারিদ্রের প্রভাবের যুক্তিটা আলোচনা করার সময় যা বলেছিলাম, এখানেও তাই খাটে - আসল প্রয়োজনটা সামাজিক নিরাপত্তা জালের, যাতে নানা অর্থনৈতিক পরিবর্তনের ফলে যাঁদের ক্ষতি হচ্ছে তাঁরা একেবারে দুঃস্থ না হয়ে পড়েন। কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তার ন্যূনতম মান নিয়ে সরকারি নিয়ন্ত্রণের স্বপক্ষে অন্য যুক্তি আছে যা আমরা এবার আলোচনা করব।

এ বার আসা যাক, স্বেচ্ছা-বিনিময় নিয়ে চতুর্থ আপত্তিতে, অর্থাৎ স্বাস্থ্য বা জীবন বিপন্ন হবার ঝুঁকি। সরকারের প্রাথমিক কর্তব্য নাগরিকদের জীবন রক্ষা করা। সেই দিক থেকে ভাবলে কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তা বা কিডনি বিক্রী করা, যেখানেই গুরুতর ভাবে স্বাস্থ্যহানি বা জীবন বিপন্ন হবার সম্ভাবনা আছে, সেখানে সরকারি হস্তক্ষেপের সমর্থনে যুক্তি বার করা খুব একটা শক্ত নয়। কিন্তু মনে রাখতে হবে, এই আলোচনার ক্ষেত্রে আমরা ধরে নিয়েছি যে সবাই প্রাপ্তবয়স্ক, সম্পূর্ণভাবে অবহিত, এবং নিজের ভালোমন্দ নিজেই সবচেয়ে ভালো বোঝেন। তার মানে এই নয়, যে এটা ভীষণ বাস্তবসম্মত অনুমান, কিন্তু এই লেখার পরিধির মধ্যে সীমিত তথ্য ও বিবেচনা ক্ষমতা থাকলে যা যা হতে পারে, তার সম্যক আলোচনা করা সম্ভব নয়। কাজেই, প্রত্যেকে নিজের ভালমন্দ বোঝেন, ধরে নিয়েই আমাদের এগোতে হবে। তাই যদি ধরি, তা হলে কেউ যদি স্বেচ্ছায় সব বুঝে নিজের জীবন বিপন্ন করে, তাতে সরকারের নাক গলানোর, বা ভালো ভাষায় বললে অভিভাবকতন্ত্রের (paternalism) কোন পরিসর আছে কি?

এখানে প্রশ্ন হল, আমার শরীরের ওপর আমার নিজের অধিকার কতটা? আমার শরীরের ওপর যে কোনও সিদ্ধান্ত কি আমি আরোপ করতে পারি, নাকি অন্য কেউ সেই সিদ্ধান্তে বাধা দিতে পারে? আত্মহত্যা করা কি আইনি করে দেওয়া উচিত? এই প্রশ্নগুলোর দার্শনিক ও আইনি জটিলতায় আমরা ঢুকব না। কিন্তু, কোনও ভুল সিদ্ধান্তের পরিণতি যদি মারাত্মক হয়, এবং তা যদি কোনও অবস্থাতেই সংশোধনযোগ্য না হয়, তা হলে যেখানে সেই ভুল হওয়ার সম্ভাবনা আছে, সেখানেও সরকার কোনও অবস্থাতেই হস্তক্ষেপ করতে পারবে না, এই অবস্থান প্রশ্নযোগ্য। অবশ্যই মনে রাখতে হবে, নাগরিকের ভুল হওয়ার সম্ভাবনার ক্ষেত্রে সরকারের হস্তক্ষেপের অধিকার অবাধ হলে সরকারও নিজের দখলদারি বাড়িয়ে চলতে পারে। কিন্তু, সেই দখলদারি ঠেকানোর জন্য "সরকার দূর হটো"-কেই মূলমন্ত্র করে নেওয়াও বিপজ্জনক। এই ভারসাম্য রক্ষার খেলাটি জটিল এবং নিরন্তর। সে প্রসঙ্গে একটু পরে আসব। আপাতত, স্বেচ্ছা বিনিময়ে স্বাস্থ্যের ক্ষতির প্রসঙ্গে ফিরি। বাস্তবেও তো দেখা যাচ্ছে যে রক্ত, অথবা শুক্রাণু-ডিম্বাণু, সবই আইনত বিক্রি করা সম্ভব। গর্ভের মতো অঙ্গ ভাড়া দেওয়াও সম্ভব। তা হলে কিডনি বিক্রির ক্ষেত্রে গোটা দুনিয়া জুড়েই এমন আইনি আপত্তি কেন? তার একটা বড় কারণ সম্ভবত এই যে কিডনি

এক বার বিক্রি করে দিলে সেই সিদ্ধান্তটি অ-পরিবর্তনসাধ্য। ফলে, সেই ক্ষতি পূরণ করার কোনও উপায় নেই। একই যুক্তিতে জীবন্ত মানুষের হৃতপিণ্ড প্রতিস্থাপনও বেআইনি। একটা কিডনি বিক্রি করে দিলে তবুও প্রাণহানির সম্ভাবনা কম, কিন্তু হৃতপিণ্ডের ক্ষেত্রে সেই ছাড়টুকুও নেই।

নিজের শরীরের ওপর আরোপ করার কোন সিদ্ধান্ত মানুষকে নিতে দেওয়া যাবে, আর কোন ক্ষেত্রে সেই সিদ্ধান্তকে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে বা প্রয়োজনে একেবারে নিষিদ্ধ করে দিতে হবে, তা স্থির করার একটা মাপকাঠি এই আলোচনা থেকে ফুটে উঠছে। বস্তুত, শুধু শরীর নয়, যে কোনও ক্ষেত্রেই এই মাপকাঠিটি ব্যবহার করা সম্ভব। মাপকাঠিটি হল, যে সিদ্ধান্তে মানুষের capability বা সামর্থ্য চিরকালের মতো সঙ্কুচিত হবে, সেই সিদ্ধান্তের পূর্ণ অধিকার কারওকে দেওয়া যায় না। তার জন্য সতর্কতা প্রয়োজন। বিধিবদ্ধ সতর্কীকরণ থেকে সম্পূর্ণ নিষেধাজ্ঞা, অনেক কিছুই করা চলতে পারে। একটা ছোট উদাহরণ দেওয়া যাক। কেউ নিজের সন্তানকে কারাটে শেখাবেন কি না, সেই সিদ্ধান্তের অধিকার তাঁর। না শেখালে তার কিছু কুফল অবশ্যই আছে, যেমন সন্তান ভবিষ্যতে আত্মরক্ষায় অনেক কম দড় হবে। কিন্তু কেউ নিজের সন্তানকে লেখাপড়া শেখাবেন কি না, সেই সিদ্ধান্তের অধিকার তাঁর নেই। সন্তানকে স্কুলে পাঠানো আইনত বাধ্যতামূলক। কারাটের সঙ্গে লেখাপড়ার ফারাক সামর্থ্যের প্রশ্নেই। কারাটে না শিখলেও ক্ষতি, কিন্তু লেখাপড়া না শিখলে যে ভাবে একটি শিশুর সামর্থ্য সঙ্কুচিত হবে, কারাটে না শেখার ক্ষতি সে তুলনায় অতি সামান্য। এবং, লেখাপড়ার না শিখে সামর্থ্যের অভাব ঘটলে তার দায় শেষ পর্যন্ত রাষ্ট্রকে, অতএব দেশের সব মানুষকেও, বহন করতে হয়।

স্বেচ্ছা-বিনিময় নিয়ে শেষ যে আপত্তিটা আলোচনা করব, সেটা হল আইনের অপব্যবহারের সম্ভাবনা । কিডনি বিক্রি নিষিদ্ধ করার সপক্ষে একটা প্রধান কারণ হল, আইনত সিদ্ধ হলে জোরজুলুমের পরিমাণও বহুলাংশে বাড়বে, বিশেষত ভারতের মতো তৃতীয় বিশ্বের দেশে। [21] কিন্তু, এই যুক্তি পেশ করার সঙ্গে সঙ্গেই উল্টো দিকের যুক্তিও উঠে আসবে— আইনত নিষিদ্ধ বলে তো আর – এই বিনিময়টি থেমে থাকেনি, কালো বাজারে দিব্যি কেনাবেচা চলছে। বরং, এই কালোবাজার থেকে দালালরা অনেক বেশি লাভ করে নিচ্ছে, আর

যাদের কিডনির প্রয়োজন সবচেয়ে বেশি, তাঁরা হয়তো বঞ্চিত হচ্ছেন তা থেকে। যুক্তিটা ভুল নয়, কিন্তু তাতে একটা মস্ত ফাঁক আছে। ভারতের মতো দেশে, যেখানে পুলিশকে বা আইনি ব্যবস্থাকে টাকা অথবা রাজনৈতিক প্রতিপত্তির জোরে ইচ্ছেমত দুমড়েমুচড়ে নেওয়া যায়, সেখানে কিডনি কেনাবেচাকে আইনসিদ্ধ করে দিলে তার অপপ্রয়োগ হওয়ার সম্ভাবনা বিপুল। কে স্বেচ্ছায় কিডনি বিক্রি করছেন আর কার কিডনি ভয় দেখিয়ে, জোর করে কেড়ে নেওয়া হচ্ছে, সেই ফারাক করার আর উপায় থাকবে না। এই ব্যবস্থার অপপ্রয়োগের ফলে যে ক্ষতি হবে, তা কালোবাজারে কেনাবেচায় ক্ষতির পরিমাণকে ছাপিয়ে যাবে। কিডনি বেচার থেকে আরো চরম উদহারণ যদি নিই, যেমন আত্মহত্যার অধিকার বা স্বেচ্ছা ক্রীতদাসত্ব তাহলে এই যুক্তিটা আরো খোলাখুলি দেখা যাবে - অসুস্থতার কারণে আত্মহত্যার অধিকার স্বীকৃত হলে তার ফাঁক গলে খুনের সংখ্যা বাড়তে পারে। অসহায় মানুষকে খুন করে সেটাকে আত্মহত্যা বলে চালিয়ে দেওয়ার সম্ভাবনা তৈরী হবে,বা এমন মানসিক চাপ সৃষ্টি করা হবে যে তাঁরা আত্মহত্যা করতে বাধ্য হবেন।

দূরতর দ্বীপ

আমাদের এই লেখার কেন্দ্রীয় প্রশ্ন হল দুজন প্রাপ্তবয়স্ক এবং অবহিত মানুষ পারস্পরিক সম্মতিক্রমে যে কোনও ধরনের চুক্তিতে আবদ্ধ হতে চাইলেই কি তাঁদের সেই চুক্তি করার অধিকার দেওয়া উচিত? আগের অংশে আমরা অবাধ বাণিজ্যের অধিকার নিয়ন্ত্রণ করার যুক্তিগুলোর ভা ল-মন্দ বিচার করলাম।

এই অংশটিতে আমরা একটা রূপকথা (parable) বলব যার মূল উদ্দেশ্য হল দেখান যে স্বেচ্ছা-বিনিময়ের স্বাভাবিক একটা সীমারেখা আছে, যেটা অতিক্রম করলে বাজার-ব্যবস্থা যে ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে আছে, অর্থাৎ আইন-ব্যবস্থা, সেটাই হুড়মুড় করে ভেঙ্গে পড়বে । অর্থাৎ, মুক্ত বাজারের নিজস্ব যুক্তিরই একটা মৌল সীমারেখা আছে - সেটাকে বেশি ঠেললে মুক্ত বাজারের সমর্থকের দৃষ্টিভঙ্গি থেকেও উল্টো ফল হতে পারে । গল্পের এই দুনিয়ার শর্তগুলো খানিক অবাস্তব ঠেকতেই পারে, কিন্তু, সেটা নেহাত সরলীকরণের স্বার্থে।

ধরা যাক তিন জন লোক, যাদের আমরা ক, খ, ও গ বলে উল্লেখ করব, এক জাহাজডুবির পর ভাসতে ভাসতে একটা জনমানবহীন দ্বীপে এসে উঠল। সেই দ্বীপে গাছপালা আছে, ফলে খাবার সংগ্রহ করা যায়। আবার, হিংস্র জন্তুও আছে। কাজেই, এই দ্বীপে বেঁচে থাকতে হলে মাত্র দুটো কাজই জরুরি: এক, আত্মরক্ষা, এবং দুই, খাদ্য আহরণ। ধরা যাক, ক খ আর গ, তিন জনই দুটো কাজই পারে, কিন্তু সমান ভাবে নয়। ক শক্তিশালী, ফলে হিংস্র জন্তুর আক্রমণ ঠেকানোর কাজটি সে অন্য দুজনের তুলনায় ভাল পারে। খ আর গ খাদ্য আহরণে দড়। কিন্তু ক-ও খাদ্য আহরণ করতে পারে, আবার খ আর গ-ও আত্মরক্ষা করতে সমর্থ। ফলে, তিন জনই একা একা, দ্বীপের তিনটি প্রান্তে বেঁচে থাকতে পারে, পরস্পরের সহযোগিতা ছাড়াই।

কিন্তু, আলাদা থাকা মানেই শ্রমের বিভাজন হবে না। যদি এক সঙ্গে থাকে এবং ক যদি একাই তিন জনের নিরাপত্তার দিকটা দেখে, আর খ আর গ খাবার সংগ্রহ করে, তাহলে তারা তাই একা থাকার থেকে ভালো থাকবে। অর্থাৎ, সহযোগিতা করলে সবারই লাভ। ধরে যাক তাদের মধ্যে ঠিক হল যে মোট সংগৃহীত খাবারের তিন ভাগের এক ভাগ করে নেবে প্রত্যেকেই। খাবার যে সমান ভাগেই ভাগ করতে হবে, সেটা অবশ্য আবশ্যিক নয়। ক বলতে পারে, যেহেতু আমি যে কাজটা করি সেটা তোমরা পারো না, অথবা, আমার খাটনি তোমাদের থেকে বেশি, কাজেই আমি বেশি খাবার নেব। ক-কে বেশি খাবার দিয়েও এই ব্যবস্থা চলবে, যত ক্ষণ না খ আর গ একা থাকলে যা হোত তার থেকেও খারাপ থাকার পরিস্থিতি হয় । তার বেশি লোভ করলে খ আর গ এর সহযোগিতা হারাবে ক ।

কিন্তু প্রশ্ন হল, এই চুক্তি বা বোঝাপড়া টিকিয়ে রাখার উপায় কী? তারা যদি বন্ধু হত বা প্রত্যেকের নীতিবোধ অতি প্রবল হত, কথা ছিল, কিন্তু ধরে নেওয়া যাক যে তারা সম্পূর্ণ নিজের স্বার্থের কথায় ভাবে এবং তার জন্যে অন্যায় আচরণ করতে তাদের বাধে না।

একটা সম্ভাব্য উপায় হল দ্বীপে আইনি ব্যবস্থা থাকা, এবং সেই আইনি ব্যবস্থার সাহায্যেই চুক্তি বলবৎ করা। ধরুন, সেই জনহীন দ্বীপে এক আশ্চর্য জাদু বাক্স বা খুড়োর কল রয়েছে। তার অসীম ক্ষমতা। যে কেউ সেই জাদু বাক্সের বোতাম টিপলেই তা চালু হয়ে যায়। এবং, চালু হতেই সেই বাক্স পরিস্থিতি বুঝে নিতে পারে, সত্যি -

মিথ্যের প্রভেদ করতে পারে, অপরাধী বা মিথ্যেবাদীকে শাস্তি হিসেবে জাদুরশ্মি নিক্ষেপ করে কঠিন (কিন্তু প্রাণে মারার মত নয়) আঘাত দিতে পারে। এই শাস্তির ভয়েই প্রত্যেকে সহযোগিতার চুক্তি মেনে চলবে। শুধু চুক্তির ক্ষেত্রেই নয়, এই বাক্স দ্বীপের তিন অধিবাসীর জীবন, স্বাস্থ্য এবং সম্পত্তিরও রাখওয়ালা। বাক্সটা এমনই ক্ষমতাবান যে সম্পত্তি চুরি বা কারও ওপর হামলার সম্ভাবনা তৈরি হলে, অভিযোগ পাওয়ামাত্র তার সুরাহা করতে পারে। সুরাহা মানে অপরাধীর শাস্তি। তাই ক-এর গায়ে জোর বেশি থাকলেও সে খ আর গ-এর ওপর সেই জোর ফলাতে সাহস পাবে না। অতএব, এই অসীম ক্ষমতাবান বাক্স থাকতে দ্বীপের তিন অধিবাসীর পক্ষেই সেরা সিদ্ধান্ত হল এক বার চুক্তিবদ্ধ হলে পরস্পরের সঙ্গে সহযোগিতা করা এবং কখনও অন্যের ওপর হামলা না করা। এমন একটা চমৎকার আইনি ব্যবস্থা থাকলে শুধু একটা সার্বিক সহযোগিতার চুক্তি নয়, আরও বহুবিধ দ্বিপাক্ষিক বা ত্রিপাক্ষিক চুক্তি সম্ভব। তেমন কোনও দ্বিপাক্ষিক চুক্তিতেই তৃতীয়, অর্থাৎ চুক্তির বাইরে থাকা দ্বীপবাসীর, পক্ষে ক্ষতিকারক হবে না, কারণ তার ক্ষতির সম্ভাবনা তৈরি হলেই যাদু বাক্স তার পাশে দাঁড়াবে।

এমন অসীম ক্ষমতাসম্পন্ন জাদু বাক্স কে সম্পূর্ণ রূপকথা বলে মনে হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু, ধনতন্ত্রের প্রাণকেন্দ্রে অবাধ আর্থিক লেনদেনের (laissez-faire) ধারণাটি রয়েছে, তার প্রাণভোমরা কিন্তু এই জাদু বাক্সের মতোই একটি আইনি ব্যবস্থা। ধনতান্ত্রিক আর্থিক ব্যবস্থার তত্ত্ব তৈরি করার সময় ধরেই নেওয়া হয়, সব চুক্তিই যাতে রক্ষিত হয়, দেশের আইনি ব্যবস্থা তা নিশ্চিত করবে। পাশাপাশি, মানুষের ধন-প্রাণের নিশ্চয়তাও দেবে আইন। মানুষ নিশ্চিন্ত হয়ে, খোলা মনে, যেমনটা চাই ঠিক তেমন ভাবে পরস্পরের সঙ্গে বাণিজ্যিক লেনদেন চালিয়ে যেতে পারবে। কিন্তু, এমন মজবুত আইনি ব্যবস্থা অতি কাম্য হলেও তা পাওয়া মুশকিল। আমাদের তিন দ্বীপবাসীও তেমনটা পাবেন, ধরে নেওয়ার কোনও কারণ নেই।

আসুন, এ বার জাদু বাক্সের ক্ষমতা একটু কমিয়ে দিই। ধরুন, বাক্সটা এখনও সম্পত্তি চুরি অথবা শারীরিক আক্রমণের সম্ভাবনাকে ঠেকাতে পারে, কিন্তু কোন চুক্তি বলবত করার ক্ষমতা তার আর থাকল না। অর্থাৎ, চুক্তি করলেই তার শর্ত মেনে চলতে হবে, এমন আইনি বাধ্যবাধকতা তুলে নেওয়া হল। তবুও দ্বীপবাসীরা নিজেদের মধ্যে খাতাকলমে না হলেও মৌখিক বোঝাপড়া করে নিতে পারে যে তারা সহযোগিতা করবে কিন্তু, কেউ ফাঁকি

দিলে পরের বার অন্যেরা আর সহযোগিতা করবে না, তখন একা থাকতে হবে। যত ক্ষণ সহযোগিতার ফলে তারা যত ভালো থাকছে, তা একা থাকার চেয়ে বেশি ততক্ষণ তারা সহযোগিতাই করবে। মানে, সহযোগিতা করতে কেউ আইনত বাধ্য হোক বা না-ই হোক, জাদু বাক্স যতক্ষণ গা-জোয়ারি এবং চুরি-ডাকাতির সম্ভাবনাটুকু ঠেকিয়ে রাখতে পারছে, তত ক্ষণ সহযোগিতাই প্রত্যেকের কাছে শ্রেষ্ঠ ব্যবস্থা।

এই দ্বীপ থেকে জাদু বাক্সটা গায়েব হয়ে গেল। ধরা যাক, তিন জন দ্বীপবাসীর মধ্যে চুক্তি বলবত করা শুধু নয়, চুরি, ডাকাতি, অথবা শারীরিক আক্রমণ প্রতিরোধ করা কোনও কিছুর জন্যেই কোনও বহির্ভূত ব্যবস্থা নেই, মানে এক জন অন্য জনের ওপর চড়াও হলে বাইরে থেকে কেউ তার প্রতিকার করতে আসবে না। তার মানে আইনের কোনও শাসন আর থাকবে না। দ্বীপবাসীরা এ ক্ষেত্রেও নিজেদের মধ্যে মৌখিক বোঝাপড়া করে নিতে পারে যে তারা সহযোগিতা করবে, বা তা সম্ভব না হলে অন্তত পরস্পরের সাথে কোন ঝামেলা করবে না। কিন্তু ক যেহেতু শক্তিশালী, তার পক্ষে এখন এই বোঝাপড়ার শর্ত ভেঙে খ ও গ-এর ওপর জোরজবরদস্তি চালাবার আকর্ষণ প্রবল হবে। ধরা যাক, ক তার বাহুবলের দৌলতে খ বা গ-এর ওপর জোর ফলিয়ে খাবারের সিংহভাগ নেওয়া শুরু করল। খ ও গ যদি পালিয়ে একা থাকার চেষ্টা করে, ক গিয়ে তাদের পাকড়াও করে আনতে পারে। খ আর গ-এর কাছে তাই শান্তিতে একা (বা দোকা) থাকার উপায়ও আর রইল না। অর্থাৎ, দ্বীপের অবস্থা হল জোর যার মুলুক তার। ভাল ভাষায় যাকে বলবেন anarchy বা নৈরাজ্য।

কিন্তু, খুব বেশি অত্যাচারের ফলে খ বা গ যদি আহত হয়ে পড়ে, বা মরেই যায়, বা দ্বীপ থেকে পালিয়ে যায়, তা হলে আর তাকে শোষণ করার উপায় থাকবে না। খাবারের একটা ন্যূনতম ভাগ তাদের না দিলেও তারা কর্মক্ষম থাকবে না। কাজেই, এই নৈরাজ্যের একটা সীমা আছে[22]। কিন্তু খ আর গ-এর দিক থেকে দেখলে, এই ব্যবস্থা আর দাস ব্যবস্থার মধ্যে বিশেষ কোন ফারাক নেই।

তার মানে দাঁড়াল, মুক্ত-বাজারপন্থী বা অতি-উদারবাদী (libertarian) দের যুক্তি দাঁড়িয়ে আছে মজবুত আইন-শৃঙ্খলা ব্যবস্থার ভিত্তির ওপরে। আমাদের রূপকথার জাদু বাক্স হল তারই রূপক। কিন্তু আমরা যেভাবে তাকে বর্ণনা করেছি, তাতে তার ভূমিকা অনেকটা দৈবের কল (deus ex machina) গোত্রের। অর্থাৎ, এই দ্বীপের সঙ্গে বা

বৃহত্তর অর্থে সমাজের সঙ্গে তার কোনও সম্পর্ক নেই। কোনও সমস্যা তৈরি হলে চলমান অশরীরির মত সহসা উদয় হয়ে তার সমাধান করে আবার উধাও হয়ে যায়।

কিন্তু বাস্তবের কাছাকাছি আসতে গেলে এ বার এই শর্তটা ত্যাগ করতেই হবে। বাস্তবে আইন যাদের মাধ্যমে চলে, তাঁরা বিচারকই হোন বা পুলিশ, উকিল বা সাক্ষী, তাঁরা সবাই সমাজের অংশ। আমাদের এই জনহীন দ্বীপের বিচারব্যবস্থায় সেই শর্তটা নিয়ে আসা যাক। ধরুন, কারও অভিযোগ পাওয়ামাত্র বিচার করার ক্ষমতা আর এই জাদু বাক্সের নেই। দুজনের মধ্যে কোন বিবাদ হলেই (সে চুক্তিভঙ্গই হোক আর চুরি-ডাকাতি-মারামারিই হোক) তৃতীয় কোন ব্যক্তির সহায়তাতেই তার ক্ষমতা সক্রিয় হবে, যাকে আমরা সাক্ষী ভাবতে পারি। সাক্ষী না পাওয়া অবধি বাক্স নিষ্ক্রিয় থাকবে। সাক্ষী এলেই তার পুরনো ক্ষমতা ফিরে আসবে। তখন সে বিচার করে শাস্তি দিতে সক্ষম।[23] এ বার আমরা দেখব, এমন একটা পরিস্থিতিতে যদি দ্বীপের তিন জনের *যে কোনও* দ্বিপাক্ষিক চুক্তি করার ক্ষমতা থাকে, তবে আইনের শাসন সম্পূর্ণ ভেঙে পড়তে পারে। অর্থাৎ, মুক্ত-বাজারপন্থীদের অবাধ বাণিজ্যের বা চুক্তির স্বাধীনতার যুক্তির মধ্যে একটা মৌলিক দ্বন্দ্ব আছে।

ধরা যাক, ক, খ আর গ-র মধ্যে প্রথমে সহযোগিতার চুক্তি হয়েছিল। সেই চুক্তির পরেও আরও দ্বিপাক্ষিক বা ত্রিপাক্ষিক চুক্তি করতে যেহেতু বাধা নেই, ফলে ক এসে খ-কে বলতেই পারে, সহযোগিতার চুক্তিতে তোমার যতটা খাবার পাওনা হত, তোমায় তার চেয়ে খানিক বেশিই দেব। তোমার নিরাপত্তাও বজায় থাকবে। কিন্তু, গ আমার বিরুদ্ধে জাদু বাক্সের কাছে কোনও অভিযোগ করলে তুমি সাক্ষী দিতে পারবে না। খ-এর পক্ষে এই প্রস্তাবে সম্মত হওয়াই যুক্তিসঙ্গত কাজ, কারণ ত্রিপাক্ষিক সহযোগিতার চুক্তিতে সে যা পাচ্ছিল, এই দ্বিপাক্ষিক চুক্তিতে সে তার বেশি পাবে। ধরা যাক এই ধরনের চুক্তি বেআইনি নয়। খ এও জানে যে ক পরে কোনও রকম চালাকি বা জোরজবরদস্তি করলে গ-এর সহায়তায় সে জাদুবাক্সের শরণ নিতে পারে, তাই তার এই প্রস্তাবে রাজি হবার কোন অসুবিধে নেই। কিন্তু অসুবিধা আছে গ-এর। খ এই প্রস্তাবে রাজি হয়ে গেলে ক জানবে, গ তার বিরুদ্ধে যে অভিযোগই করুক না কেন, তার কোনও বিচার হবে না, কারণ খ সাক্ষী দেবে না। অতএব, ক গ-এর থেকে তার খাবারের ভাগ থেকে অনেকটাই নিয়ে নিতে পারে।

তাই এই নতুন চুক্তি চালু হওয়া মাত্রই গ বুঝতে পারবে, তার বিপদ আসন্ন। এখনও গোড়ার সহযোগিতার চুক্তির ভরসায় বসে থাকলে তার মহা ক্ষতি। তার পক্ষে পরিস্থিতিটা নৈরাজ্যের, ফলে গ পত্রপাঠ ক এবং খ-এর সঙ্গ ত্যাগ করে একা থাকতে চলে যাবে। কিন্তু, গ চলে যাওয়া মানে সমাজে পড়ে থাকল বাকি দুজন। এক জন অন্য জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনলেও জাদু বাক্স অকেজো, কারণ সাক্ষী দেওয়ার মতো তৃতীয় পক্ষ আর সমাজে থাকবে না। অতএব, এবার খ-কেও বাস করতে হবে নৈরাজ্যের মধ্যেই। যেহেতু নৈরাজ্যের চেয়ে একা থাকা ভাল, ফলে সে-ও দ্বীপের অন্য প্রান্তে চলে গিয়ে একা থাকতে আরম্ভ করবে। পুরো ব্যবস্থাটাই ভেঙে পড়বে। আর একটু তলিয়ে ভাবলে দেখা যাবে, যে যার মত একা একা থাকল, আসল পরিস্থিতিটা তার থেকেও খারাপ হবে। যেহেতু জাদুবাক্স সাক্ষীর অভাবে সম্পূর্ণ অকেজো, দ্বিপাক্ষিক চুক্তি তো দূরের কথা, ক গিয়ে খ বা গ-এর ওপর জবরদস্তি করলে সেটা আটকাবার উপায় নেই। তাই নৈরাজ্যই এই দ্বীপের ভবিতব্য।

লক্ষ্য করে দেখুন, এই পরিস্থিতির সম্ভাবনা অতি-উদারবাদীদের পক্ষে খুবই অস্বস্তিকর। যদি শুধু সহযোগিতা বন্ধ হয়ে যেত কিন্তু সবাই একা একা নিজের মতো থাকতে পারত, তা হলে অতি-উদারবাদীরা বলতে পারতেন, না হয় লোকে আগের চেয়ে ভাল নেই, কিন্তু তাদের নিজেদের মত থাকার স্বাধীনতা তো আছে। স্বাধীনতা যে সব সময়ে বিনামূল্যে পাওয়া যাবে তার কোনও নিশ্চয়তা নেই। অনেক সময়ে তার দাম দিতে হয়। এই ক্ষেত্রে, চুক্তির অবাধ স্বাধীনতা থাকার জন্যে তারা কোন রকম চুক্তি-ই করতে পারবে না সেটা দুর্ভাগ্যজনক, কিন্তু এই স্বাধীনতা উপভোগ করার জন্যে তারা না হয় এই ক্ষতিটা মেনে নেবে।

কিন্তু সম্পূর্ণ নৈরাজ্য হলে তো খ ও গ-এর একা একা নিজের মতো শান্তিতে থাকার স্বাধীনতাও থাকবে না, তাদের ক-এর স্বেচ্ছাচার মেনে নিতেই হবে। অর্থাৎ, সবার স্বাধীনতা অবাধ করতে গিয়ে সম্পূর্ণ উল্টো ফল হতে পারে- সংখ্যাগরিষ্ঠের স্বাধীনতা তলানিতে গিয়ে ঠেকতে পারে। তাই সর্বোচ্চ *সম্ভাব্য* স্বাধীনতা আর সম্পূর্ণ অবাধ বাণিজ্যের অধিকারের মধ্যে একটা মৌলিক দ্বন্দ্ব আছে। অতি-উদারবাদীদের স্বপ্নের সমাজ তাই একটা ইউটোপিয়া, এক দূরতর দ্বীপ, বিকেলের নক্ষত্রের কাছে!

জাদু বাক্সের রূপকথা ছেড়ে বাস্তব পৃথিবীতে ফেরা যাক। এই গল্পের তাৎপর্য হল, আমরা যে সমাজের কথা বলছি, তার আইনি ব্যবস্থাটি দৈবের কল নয়, সমাজের ওপর নির্ভরশীল। সেই সমাজে মানুষের যদি যে কোনও চুক্তি করার অধিকার থাকে, তবে সেই অধিকার সম্পূর্ণ সমাজটিকেই অকেজো করে দিতে পারে। এবং, কোনও দুজনের মধ্যে তৈরি হওয়া চুক্তি প্রভাব ফেলতে পারে তৃতীয় জনের ওপর। অর্থাৎ, সেই দ্বিপাক্ষিক চুক্তির externality বা অতিক্রিয়া আছে। কাজেই, এই সমাজের কেউই সমাজ নিজের সম্পূর্ণ মালিক নন, তিনি সমাজের আইনি ব্যবস্থার অংশীদারমাত্র। কাজেই, সব ধরনের চুক্তি করার অধিকার সমাজ তাদের না-ও দিতে পারে।

কেউ প্রশ্ন করতেই পারেন, অর্থনীতির তত্ত্বে যে rationality বা যুক্তিনির্ভরতা প্রায় ভিত্তিপ্রস্তরের মতো কাজ করে, এখানে আমরা তার কথা ভুলে যাচ্ছি। যুক্তিনির্ভরতার যুক্তি বলবে, খ একেবারে গোড়াতেই দেখতে পাবে, ক-র সঙ্গে এই দ্বিপাক্ষিক চুক্তি শেষ পর্যন্ত তার পক্ষেই ক্ষতিকারক হয়ে দাঁড়াবে। ফলে, সে এই ধরনের কোনও চুক্তিতে রাজিই হবে না। এই আপত্তিটার উত্তর এখানেই দিয়ে রাখা যাক। আপত্তির যুক্তিটা দাঁড়িয়ে আছে কতগুলি অন্য অনুমানের ওপর। প্রথমত, যিনি আপত্তি জানাবেন, তিনি ধরে নিচ্ছেন যে খ ভবিষ্যতকে যথেষ্ট গুরুত্ব দেয়। সেটা না-ই হতে পারে। দ্বিতীয়ত, আমাদের উদাহরণে লোকসংখ্যা মাত্র তিন। তাই এ কথা ঠিক যে ভবিষ্যতকে যথেষ্ট গুরুত্ব দিলে খ-র বোঝা উচিত এই ধরনের চুক্তিতে তার নিজেরই আখেরে ক্ষতি হবে, তাই সে রাজিই হবে না এরকম কোন চুক্তির মধ্যে ঢুকতে। কিন্তু চার জন লোক থাকলেই ছবিটা বদলে যাবে। ধরা যাক, ঘ নামক চতুর্থ এক জন লোক ঢুকে পড়ল আমাদের দ্বীপে। এ বার, ক আর খ যতই চুক্তি করুক, তাতে গ-এর অসুবিধে নেই, কারণ ক-র বিরুদ্ধে অভিযোগ করলে জাদু বাক্সের সামনে ঘ সাক্ষী দিতে যাবে। আর তাই ভেবে খ নিশ্চিন্তে ক-এর সাথে চুক্তি করতে পারে । কিন্তু একই যুক্তিতে ক খ-র মতো ঘ-কেও বাড়তি খাবার দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে হাত করতে পারে। খ এবং ঘ-এর মধ্যে বোঝাপড়ার অভাবে নৈরাজ্যের সম্ভাবনা থেকেই যায়, তা তারা যতই যুক্তিবাদী হোক বা ভবিষ্যতকে গুরুত্ব দিক। স্বেচ্ছাচারের সূচনা তো দেশে দেশে কালে কালে এই ভাবেই হয়। সাধারণ মানুষের মধ্যে দলবদ্ধতার সুযোগ নেই, এবং শক্তিশালী কোনও ব্যক্তি বা গোষ্ঠী তাদের মধ্যে ভেদাভেদ সৃষ্টি করে নিজেদের ক্ষমতা কায়েম করে রাখে ।[24]

আমাদের এই দ্বীপরাজ্যের উদাহরণে আমরা দেখেছি, কী ভাবে সাক্ষী হওয়ার অধিকারটুকু ছেড়ে দেওয়ার মতো আপাত-সামান্য ঘটনা শেষ পর্যন্ত পৌঁছে যেতে পারে সম্পূর্ণ নৈরাজ্যে। সাক্ষী হওয়ার অধিকার বিক্রি জিনিসটা খুব মেকি লাগছে শুনতে? ভেবে দেখলে, সাক্ষী হওয়ার অধিকার বিক্রি করে দেওয়া আর স্বেচ্ছা-ক্রীতদাসত্বে সম্মত হওয়ার মধ্যে চরিত্রগত কোনও ফারাক নেই। এ বার বলতে পারেন, স্বেচ্ছা-ক্রীতদাসত্ব আইনি করে দেওয়ার চিন্তাটা তো আরও অবাস্তব। সেটা নিয়েই বা মাথা ঘামাতে যাব কেন? মাথা অবশ্য অনেকেই ঘামিয়েছেন। খ্যাতনামা অতি-উদারবাদী দার্শনিক রবার্ট নজিক এই উদাহরণটা ব্যবহার করার পর তা নিয়ে দার্শনিক, আইনবিদ এবং অর্থনীতিবিদদের মধ্যে অনেক তর্ক হয়েছে। সেই তর্কের জল কোথা থেকে কোথায় গড়াল, আপাতত তার মধ্যে ঢুকব না।

কিন্তু, স্বেচ্ছা ক্রীতদাসত্ব নিয়ে কেন মাথা ঘামানো প্রয়োজন, তার একটা অন্য কারণ উল্লেখ করি। লেখার প্রথম দিকে অমানবিক পরিবেশের কারখানা নিয়ে কিছু কথা বলেছিলাম। তেমন কারখানার উদাহরণ সামনে এলেই মুক্ত-বাজারপন্থীরা বলে থাকেন, যারা এই পরিবেশে কাজ করছে তারা স্বেচ্ছায় করছে। আমরাও মেনে নিয়েছি যে এখানে আসল সমস্যাটা অসাম্য। শ্রমের বাজার এই অসাম্যকে আমাদের চোখের সামনে স্পষ্ট মেলে ধরেছে, এবং অসাম্যকে বাড়িয়েছেও বটে, কিন্তু সৃষ্টি করেনি। এও ঠিক যে এই অসাম্যকে দূর না করলে, মূল সমস্যার সমাধান হবে না।

মুশকিল হল, সরকার যদি শ্রমিকদের কাজের পরিবেশ, নিরাপত্তা এবং তাদের কিছু মৌলিক অধিকার বিষয়ে নিয়ন্ত্রণ জারি করে (যেমন, টানা কত ঘন্টা কাজ করা যাবে তা বেঁধে দেওয়া, কর্মস্থানে অযোগ্যতা বা অবাধ্যতার জন্যে কিছু ধরনের শাস্তি বেআইনি করে দেওয়া, ভোট হলে বা সাক্ষী দে ওয়ার ডাক পড়লে ছুটি পাওয়া), মুক্ত-বাজারপন্থীদের হইহই করে উঠবেন। বলবেন, এতে কারখানার মালিকদের লাভ কমবে, এবং শ্রমের চাহিদা কমবে, ফলে বেকারত্ব বাড়বে। তাঁদের আপত্তিটি ভ্রান্ত নয়। এই পৃথিবীতে কোনও কিছুই বিনামূল্যে হয় না। এও ঠিক, শ্রমিক বা কর্মচারীদের অধিকারের নাম করে যে অনেক সময় যে ধরনের দাবিদাওয়া হয়, তাতে যে

ব্যবসায়ী বা শিল্পপতি পাততাড়ি গুটিয়ে পালাবেন তা আশ্চর্য নয়। যতই হোক, না পোষালে বিনিয়োগ না করার গণতান্ত্রিক অধিকার তাঁদেরও আছে। কিন্তু, সেই অধিকারে এসেই এই গল্পটা ফুরিয়ে যায় না।

লক্ষ্য করে দেখুন যে শ্রমিকদের অধিকার কমাতে কমাতে যুক্তিগত ভাবে যদি চরম সীমায় নিয়ে যাওয়া যায়, তখন আবার সেই স্বেচ্ছা-ক্রীতদাসত্বের উদাহরণে ফিরে যাব। আমাদের গল্পের যুক্তি ব্যবহার করে বলা যায়, শ্রমিকরাও নাগরিক এবং তাই আইন-ব্যবস্থা ও গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা বজায় রাখতে গেলেও তাদের এই অধিকারগুলো থাকা এক প্রয়োজনীয় বিনিয়োগ। এই ধরনের নাগরিক অধিকার সুরক্ষা না করলে মুক্তবাজার দ্রুতগতিতে সমাজকে যে জায়গায় নিয়ে যাবে সেখানে আইন বা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা বিপন্ন হয়ে পড়বে। তখন কিন্তু মুক্ত বাজারও আর মুক্ত থাকবে না। অজস্র বন্ধন মাঝেই লভিতে হবে মুক্তি, মহানন্দময় !

সবার ওপরে

আমাদের রূপকথার দ্বীপ থেকে বাস্তবে ফেরার সময় আমরা যে ক'টা শিক্ষা সঙ্গে নিয়ে এলাম, তার মধ্যে প্রথমটা হল, বাণিজ্যের স্বাধীনতা নয়, সাম্য নয়, মানব সমাজের সবচেয়ে প্রাথমিক এবং গুরুত্বপূর্ণ স মস্যা হল শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখা। আইনি ব্যবস্থা জোরালো না হলে জোরজুলুমের সম্ভাবনা অতি প্রবল, আর তা হলে ব্যক্তি-স্বাধীনতা, অবাধ বাণিজ্যের অধিকার, বা সাম্য যাই মূল উদ্দেশ্য হোকনা কেন, সফল হবে না। সমাজে যেহেতু সব সময়েই ক্ষমতাবান এবং ক্ষমতাহীন লোকেদের সহাবস্থান থাকে, তাই ক্ষমতাবানদের ক্ষমতাকে সীমার মধ্যে রাখতে আইন-কানুন, গণতন্ত্র এবং অন্য নানা প্রতিষ্ঠান (যার মধ্যে বহুনিন্দিত সুশীল সমাজ এবং সংবাদমাধ্যমও আছে) আবশ্যক। পরিকাঠামো ছাড়া যেমন অর্থনীতি চলে না, এও হল এক অদৃশ্য কিন্তু অত্যাবশ্যক পরিকাঠামো ।আসলে ব্যক্তিস্বাধীনতাবাদীদের দর্শনের একদম প্রাণকেন্দ্রে একটা স্ববিরোধ রয়েছে। এই দর্শনের মূল যুক্তি হল, তৃতীয় পক্ষের ওপর প্রত্যক্ষ ভাবে কোন নেতিবাচক প্রভাব যতক্ষণ না পড়ছে, যে জিনিসের মালিকানা একান্ত ভাবেই আমার, তাকে যে ভাবে খুশি ব্যবহার করার বা বি নিময় করার অধিকার আমার রয়েছে । কিন্তু এর জন্যে প্রয়োজন এক অতি শক্তিশালী আইনি ব্যবস্থা । এমন এক আইনি শাসন এবং

প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো যে চুক্তিতে আবদ্ধ হয়ে তার পর তার শর্ত না মানলে, অথবা আইনশৃঙ্খলার প্রশ্নে এক চুল এ দিক ও দিক হলে তার হাত থেকে কারও নিস্তার নেই। এমন মহাক্ষমতাবান আইনি ব্যবস্থা থাকলেই ব্যক্তিস্বাধীনতাবাদী অর্থনীতির উড়ান অপ্রতিরোধ্য। ব্যক্তিস্বাধীনতাবাদীরা ধরে নেন, সেই আইনি ব্যবস্থার চরিত্রটি দৈবের কলের মতো । কিন্তু সর্ষের মধ্যেই তো ভূত – ক্ষমতার অপব্যবহার রোধ না করলে অর্থনৈতিক স্বাধীনতা বজায় রাখা সম্ভব নয়, আর এত শক্তিশালী আইন ব্যবস্থা থাকলে তার ক্ষমতার অপব্যবহার হতে কতক্ষণ? আসল প্রশ্ন এটাই - কোন ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর হাতে ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হওয়া এবং তার যথেচ্ছ অপব্যবহার হওয়া আটকানো যায় কি করে?

ভেবে দেখলে, সমাজতান্ত্রিক পরিকল্পনা আর ব্যক্তিস্বাধীনতাবাদী মুক্ত বাণিজ্য, বিশ্বাসের উভয় মেরুতে দাঁড়িয়ে থাকা দুই দর্শনের মধ্যে একটা জায়গায় আশ্চর্য মিল রয়েছে। বাজারের দর্শনকে আক্রমণ করতে যাঁরা এক পায়ে খাড়া, সেই সনাতনী বামপন্থীদের চিন্তার গোড়াতেও আছে "কেন্দ্রীয় পরিকল্পক" বলে এক জন মহাক্ষমতাবান শক্তির (ব্যক্তি বা পার্টি বা সংস্থা) ওপর অগাধ বিশ্বাস। সেই শক্তি সব কিছু জানে, তার হাতে অসীম ক্ষমতা। সেই ঠিক করে দেবে, কোথায় কতটা উৎপাদন হবে, কে কতখানি ভোগ করতে পারবে। এই হিসেব নিখুঁত হলেই বাজার ব্যবস্থার এলোমেলো এবড়োখেবড়ো রাস্তা এড়িয়ে অর্থনীতি চলবে পরিকল্পিত অর্থনীতির মসৃণ রাজপথ ধরে। আমরা আগের একটি লেখায় সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় পরিকল্পনার সমস্যা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছি ।[25] সংক্ষেপে বলতে গেলে, এই কেন্দ্রীয় পরিকল্পকও একটা দৈবের কল । তাই এই দুই বিপ্রতীপ, প্রতিস্পর্ধী আর্থিক দর্শনেরই একেবারে গোড়ায় রয়েছে রূপকথা। এবং, প্রায় একই রকম রূপকথা - অগাধ ক্ষমতা যার হাতে, তিনি নিরপেক্ষ ভাবে শুধু সমাজের মঙ্গলসাধনই করে যাবেন, সে মঙ্গল সাম্যবাদ-ই হোক আর ব্যক্তিস্বাধীনতার বিকাশ।

সর্বশক্তিসম্পন্ন পরিকল্পক যেমন হয় না, সমাজের ঊর্ধ্বে থাকা আইনব্যবস্থার দৈবের কলও তেমনই নেই। তাহলে আছেটা কি? কোন ব্যবস্থা দিয়ে আমরা সরকার, বাজার, আইনব্যবস্থার ওপর নজর রাখতে পারব? আমাদের চিরপরিচিত, শত-নিন্দিত কিন্তু সবেধন নীলমনি গণতন্ত্র । পাঠকের মনে হতে পারে, এতক্ষণ ছিল রুমাল, হঠাৎ হতে গেল বেড়াল! এতক্ষণ কথা চলছিল বাজারের সীমা নিয়ে, তার থেকে গণতন্ত্র এলো কোথা থেকে? আসলে ক্ষমতার অপব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করতে কোন পেয়াদার কথা ভাবলে ওই ভালো একনায়কের ভ্রান্ত যুক্তির ফাঁদে পড়তে হবে । এই পৃথিবীতে যেমন নেই কোন বিশুদ্ধ চাকরি, সেইরকমই নেই কোন ভালো একনায়ক । হাজারো সমস্যা সত্ত্বেও গণতন্ত্রে যে পারস্পরিক দায়বদ্ধতার জালে আমরা সবাই বাঁধা, ক্ষমতার অপব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করার এই একমাত্র ব্যবস্থাই আমরা জানি ।

ব্যক্তিস্বাধীনতার সঙ্গে দেশের রাজনৈতিক ব্যবস্থার সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা খুব কম হয়নি। অর্থনৈতিক স্বাধীনতার সঙ্গে রাজনৈতিক স্বাধীনতার যৌক্তিক সম্পর্ক নিয়েও দীর্ঘ তর্ক হয়েছে। বাজার অর্থনীতি ও ব্যক্তিস্বাধীনতাবাদের পক্ষে সেই তর্কের সবচেয়ে খ্যাতনামা প্রবক্তা সম্ভবত মিলটন ফ্রিডম্যান। তাঁর বক্তব্য ছিল, দেশের অর্থনৈতিক সম্পদ যদি রাষ্ট্রের কুক্ষিগত হয়, কারও যদি ব্যক্তিগত সম্পদ রাখার অধিকার না থাকে, তবে ব্যক্তিস্বাধীনতা নামক কোনও বস্তু টিকতে পারে না। যুক্তিটা জোরদার। সামান্য ব্যাখ্যাতেই সেই যুক্তির জোর দেখতে পাওয়া সম্ভব। সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণ ব্যতীত রাষ্ট্র তার কুক্ষিগত আর্থিক সম্পদের উৎপাদনশীল ব্যবহার করতে পারে না ঠিকই, কিন্তু সাধারণ মানুষেরও সেই রাষ্ট্রীয় সম্পদ প্রয়োজন, তাদের দক্ষতা বা শ্রম ব্যবহার করার জন্যই। রাষ্ট্র, সমস্ত আর্থিক সম্পদের মালিক হওয়ার সুবাদে, বেছে নিতে পারে কোন নাগরিক সেই সম্পদ ব্যবহার করতে পারবে, আর কে পারবে না। অনুমান করা সম্ভব, শাসকদের বিরুদ্ধে সরব হওয়ার পরও সেই সম্পদ ব্যবহারের অধিকার কারও থেকে যাবে, এটা নেহাতই কষ্টকল্পনা। অর্থাৎ , রাষ্ট্রের হাতে সম্পদের মালিকানা থাকলে সেই রাষ্ট্রের রাজনৈতিক বিরোধী হওয়ার আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করতে হবে, আর নয়তো মেনে নিতে হবে সুতীব্র বঞ্চনা, এমনকী অত্যাচারও। আর, এই বিপুল সম্পদের অধিকারী রাষ্ট্রনায়করা যে ক্রমেই সম্পত্তিকে

রাষ্ট্রীয় থেকে ব্যক্তিগত করে নেওয়ার চেষ্টা করবেন, সেটাও অনুমান করা চলে। অতএব, অর্থনৈতিক স্বাধীনতা না থাকলে রাজনৈতিক স্বাধীনতাপ্রাপ্তির সম্ভাবনা শূন্য।

কিন্তু উল্টো দিকে এটাও সত্যি যে ব্যক্তিগত সম্পদের অধিকার থাকলেই তা রাজনৈতিক স্বাধীনতায় পৌঁছে দেয় না। পশ্চিম এশিয়ার দেশগুলো থেকে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া, অথবা চিন, বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে পুঁজিবাদের বিপুল বিকাশ কিন্তু রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জনের পথে তাদের এক পাও এগিয়ে দেয়নি। বস্তুত, চূড়ান্ত অগণতান্ত্রিক বহু বিনিময়ই দিব্য খাপ খেয়ে যায় পুঁজিবাদের যুক্তির সঙ্গে, ব্যক্তিস্বাধীনতার দাবির সঙ্গে।

আসলে, ধনতন্ত্রের প্রবক্তারা মাঝেমধ্যেই একটা গোলমাল করে ফেলেন। তাঁরা ব্যক্তিগত সম্পদের অধিকারের সঙ্গে নাগরিক অধিকারের প্রভেদরেখাটা বেমালুম ভুলে যান। পুঁজিবাদ ব্যক্তিগত সম্পদের অধিকারকে স্বীকৃতি দেয়, অবশ্যই। কিন্তু, পুঁজিবাদ প্রতিষ্ঠিত হলেই আপনাআপনি নাগরিক অধিকারও আসবে, এমন দাবি করলে মুশকিল। সম্পদের চরিত্রই এমন যে সেটা কখনও সমবণ্টিত নয়। অরওয়েলের পশুখামারের মতোই কিছু কিছু মানুষ অন্যদের তুলনায় একটু বেশি সমান। এই যেমন মুকেশ অম্বানির আন্তিলা নামক ২৭ তলার মূর্তিমান দম্ভটির নিরাপত্তাবিধানে যখন পুলিশকর্মীর অভাব হয় না, ঠিক তখনই রাষ্ট্রযন্ত্র এসে নোনাডাঙা থেকে কিছু কপর্দকহীন মানুষকে উচ্ছেদ করতে পারে। সমাজতন্ত্রে যেমন রাষ্ট্রযন্ত্রের পরিচালকরা চেষ্টা করতে থাকেন সব সম্পদের ব্যক্তিগত অধিকারী হয়ে বসার, পুঁজিবাদী দুনিয়াতেও তেমনই ব্যক্তিগত পুঁজির অধিকার খালি অসাম্য বাড়িয়ে চলতে চায়। আর, তাতে চাপা পড়ে যায় গণতন্ত্র। শেষ পর্যন্ত সেই গোষ্ঠীশাসনতন্ত্রই পড়ে থাকে।

তাই অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ছাড়া গণতন্ত্র হওয়া সম্ভব কিনা সেটা যেমন খুবই ন্যায্য প্রশ্ন, গণতন্ত্র ছাড়া অর্থনৈতিক স্বাধীনতা বজায় থাকা সম্ভব কি না, সেটাও ভেবে দেখার বিষয়। এই কথাটা যে পুঁজিবাদের সবচেয়ে বড় প্রবক্তারা একেবারে বোঝেননি, তা নয়। সেই মুখ্য প্রবক্তাদের এক জন যদি হন মিলটন ফ্রিডম্যান, অন্য জন নিঃসন্দেহে ফ্রেডরিক হায়েক। রবার্ট সোলো একটি সাম্প্রতিক প্রবন্ধে লিখেছেন, "হায়েকও বিলক্ষণ জানতেন, কোনও রকম বাধাহীন উদার বাণিজ্য আসলে অসম্ভব। সেই বাণিজ্যে যারা সফল হবে, তারা চেষ্টা করবে একচেটিয়া অধিকার স্থাপন করার। কেউ কেউ সেই চেষ্টায় সফলও হবে। যাদের কাছে বেশি তথ্য থাকবে, তারা

তুলনায় অপেক্ষাকৃত কম জ্ঞানগম্যির লোককে ঠকানোর চেষ্টা করবে। তাতে গোটা ব্যবস্থাটাই অকুশলী হয়ে পড়বে। এবং, সেই অকুশলী ব্যবস্থায় যে আর্থিক বণ্টন হবে, সেটায় অসাম্য তো থাকবেই, অন্যায্যতাও থাকবে। বিশ্বের সব শিল্পায়িত দেশেই যে বেকারত্বের দীর্ঘ ইতিহাস আছে, খরচ কমিয়ে লাভ বাড়াতে পরিবেশের বারোটা বাজানো, এসব এমনি এমনি হয়না - ধনতন্ত্রের চরিত্রই তাকে এই সব পথে ঠেলেছে ।"[26] ফ্রিডম্যান, যাকে মুক্তবাজার পন্থার মহাগুরু বলে মানা হয়, তিনিও লিখেছেন, সরকারের কাজ শুধু আইনকানুন বজায় রাখা আর ব্যক্তিগত মালিকানা এবং চুক্তি বলবত করা নয়, একচেটিয়া অধিকার এবং চরম অসাম্যের বিরুদ্ধে সদাজাগ্রত থাকাও তার কর্তব্য। আবার এও ঠিক যে নানা বিতর্কের উত্তাপে হায়েক এবং ফ্রিডম্যান অনেক সময়েই এমন মন্তব্য করেছেন যার মূল সুর হল "সরকার খারাপ, বাজার ভালো"। আর এই সাদা-কালো ভালো-মন্দের ছকে পড়ে রাজনীতির "তুই বেড়াল না মুই বেড়াল" বিতর্কের অঙ্গনে হারিয়ে যায় অর্থনৈতিক স্বাধীনতা এবং গণতন্ত্রের আবশ্যিকভাবে পরিপূরক সম্পর্কটি ।

হোক কলরব

আসলে এই দুনিয়ায় কোথাও কোনও জাদু বাক্স নেই। দৈবের কলের মতো আইনি ব্যবস্থাও নেই, আর কোনও ভাল একনায়কও নেই। দুটোই রূপকথা, কারণ কোনও ব্যবস্থাতেই সেই একনায়ক বা আইনরক্ষকদের ঠিক ভাবে কাজ করে চলার মতো যথেষ্ট প্রণোদনার কথা ভাবা হয়নি। ক্ষমতা যত বাড়ে, সেই ক্ষমতা অপব্যবহারের প্রণোদনাও ততই বাড়তে থাকে। কাজেই, যে প্রশ্নটা অপরিহার্য হয়ে ওঠে, সেটা হল, নজরদারের ওপর নজর রাখবে কে? যুক্তি বলবে, নজরদারের ওপর নজরদারির ধাপ বাড়তেই থাকবে, তার শেষ নেই।

বাস্তবে অবশ্য সমাজ এই সমস্যার একটা সমাধান বের করে নিয়েছে। সেই সমাধানের নাম গণতন্ত্র এবং আইনের শাসন। সেখানে নজরদারির কাজটা ধাপে ধাপে ওপরে ওঠে না, বরং বৃত্তাকারে ঘুরতে থাকে। আমরা সবাই একে অপরের ওপর নজর রাখি। সবার ওপরে মানুষই সত্য, তাহার উপরে সদাশয় কেন্দ্রীয় পরিকল্পক বা সদাজাগ্রত আইনব্যবস্থার কাল্পনিক ছত্রছায়া নেই। অস্বীকার করার উপায় নেই, গণতন্ত্র ব্যবস্থাটা এলোমেলো।

গণতন্ত্রের কোলাহলে অনেক সময়েই প্রাণ ওষ্ঠাগত হয় । মুক্ত বাজার বা আদর্শ সমাজতন্ত্রের ভাবনার যে যৌক্তিক স্বচ্ছতা, তা এখানে নেই। কিন্তু, এই ব্যবস্থাটি যা পারে, আদর্শ মুক্ত বাজার বা সমাজতন্ত্রে তা অসম্ভব। সমাজের সার্বিক মঙ্গলের জন্য যতটুকু জোর খাটানো দরকার, এই ব্যবস্থায় তা সম্ভব, কিন্তু সেই জোরের উৎসটি কেন্দ্রীভূত নয়, বরং বিকেন্দ্রিত। সেখানে পরস্পরের ওপর নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখার উপায় রয়েছে। ভুল হলে সেটা ঠিক করে নেবার মতো নমনীয়তা আছে।

অর্থাৎ, মুক্ত বাজার নয়, কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা নয়, এই পৃথিবীকে শিশুর বাসযোগ্য করে যাওয়ার পথের দিশা খুঁজতে হবে গণতন্ত্রের পরিসরের নিত্য বিকাশে। উদারবাদীরা ঠিক বলেছেন, অর্থনৈতিক স্বাধীনতা গণতন্ত্র কে শক্তিশালী করে। অর্থনৈতিক স্বাধীনতা না থাকলে বাকস্বাধীনতা এবং রাজনৈতিক স্বাধীনতাও শেষ পর্যন্ত থাকে না, এর প্রমাণ সোভিয়েত ইউনিয়নের মত তথাকথিত সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির অভিজ্ঞতা থেকে পরিষ্কার, সনাতনী বামপন্থীরা তা মানতে চান বা না চান। কিন্তু, গণতন্ত্র ছাড়া অর্থনৈতিক বা কোনও রকমের স্বাধীনতাই দীর্ঘমেয়াদে বজায় রাখা সম্ভব নয়, বাজারও গোষ্ঠীতন্ত্রে পরিণত হতে বাধ্য । নয়া-উদারবাদীদের প্রিয় চারণভূমি পিনোশের চিলি[27] থেকে নব্য-চীন সহ পূর্বপ্রাচ্যের কড়া শাসনের ধনতন্ত্রের (authoritarian capitalism) মডেলে সেই একই গল্প, তা তাঁরা মানুন আর না-ই মানুন।

তবে এ গণতন্ত্র শুধু পাঁচ বছরে এক দিন ভোট দিতে যাওয়ার পরব বা আইনের শাসন নয়। এ হল প্রতিদিনের আলাপ-আলোচনা-বোঝাপড়া-ঝগড়া-বিতর্ক-প্রতিবাদের কলরবমুখর নাগরিক পরিসরের গণতন্ত্র।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার: লেখার বিষয়বস্তু ও আঙ্গিক নিয়ে মনীষিতা দাশ, পরীক্ষিৎ ঘোষ, অনির্বাণ চট্টোপাধ্যায়, টিম বেসলি, প্রণব বর্ধন, জন ডি কুইট, সারণ ঘটক, সুমন ঘোষ, ঈশানী দত্ত রায়, এবং তীর্থঙ্কর রায়ের সঙ্গে আলোচনা করে উপকৃত হয়েছি। প্রবন্ধটির খসড়া খুঁটিয়ে পড়ে অনেক মূল্যবান পরামর্শ দিয়েছেন মনীষিতা দাশ, অনির্বাণ চট্টোপাধ্যায়, এবং ঈশানী দত্ত রায়।

অন্তর্টীকা

---

[1] এই তিনটি মাপকাঠি প্রসঙ্গে আলোচনার জন্য দেখুন অমর্ত্য সেনের Markets and Freedoms: Achievements and Limitations of the Market Mechanism in Promoting Individual Freedoms, *Oxford Economic Papers*, October 1993।

[2] এ প্রসঙ্গে বিস্তারিত আলোচনার জন্য দেখুন Amartya Sen, The Moral Standing of Market, *Social Philosophy and Policy*, Spring 1985

[3] Milton Friedman, *Capitalism and Freedom*, University of Chicago Press, 1962

[4] এই নামটি একটু বিভ্রান্তিকর কারণ একদিক থেকে দেখলে অর্থনীতির সব ধারাই মানুষের আচরণ নিয়ে চর্চা করে। এর সূত্র হল এই চিন্তাটি যে যুক্তিসঙ্গত চয়নের তত্ত্বের চশমা পরে নয়, আগে খালি চোখে দেখা যাক মানুষের আচরণ কী।

[5] একই যুক্তিতে যে সব সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে অপ্রাপ্তবয়স্ক, এবং বার্ধক্য বা অসুস্থতার কারণে মানসিক ভাবে সম্পূর্ণ সক্ষম নন এমন প্রাপ্তবয়স্করা জড়িত, সেগুলিকে আমাদের আলোচনার পরিধির বাইরে রাখছি ।

[6] http://www.vogue.co.uk/news/2014/06/23/primark-garment-label-forced-to-work-exhausting-hours, accessed on 30.06.2014

[7] http://www.dailymail.co.uk/news/article-2103798/Revealed-Inside-Apples-Chinese-sweatshop-factory-workers-paid-just-1-12-hour.html, accessed on 02.07.2014

[8] http://www.salon.com/2013/03/21/sweatshops_still_make_your_clothes/, accessed on 02.07.2014

[9] http://www.forbes.com/sites/alyssaayres/2014/04/24/a-guide-to-the-rana-plaza-tragedy-and-its-implications-in-bangladesh/, accessed on 02.07.2014

[10] https://www.dosomething.org/facts/11-facts-about-sweatshops, accessed on 02.07.2014

[11] http://www.webmd.com/infertility-and-reproduction/features/womb-rent-surrogate-mothers-india, accessed on 28.06.2014

[12] http://www.ivanhoe.com/smartwoman/p_swstory.cfm?storyid=21769, accessed on 28.06.2014

[13] http://www.newyorker.com/reporting/2008/01/07/080107fa_fact_elliott?currentPage=all, accessed on 28.06.2014

[14] Michael J. Sandel, What Money Can't Buy: The Moral Limits of Markets, Penguin UK, 2012.

[15] http://www.businessinsider.com/a-chinese-boy-sells-his-kidney-to-buy-an-ipad-2011-6?IR=T, accessed on 12.09.2014

[16] http://www.bbc.co.uk/ethics/slavery/modern/law.shtml, accessed on 08.07.2014

[17] এই নিয়ে রবার্ট নজিকের বিখ্যাত বই *Anarchy, State, and Utopia* (Oxford: Basil Blackwell, 1974) দ্রষ্টব্য ।

[19] Alvin E. Roth, Repugnance as a Constraint on Markets, Journal of Economic Perspectives, Volume 21, Number 3, Summer 2007.

[20] Kaushik Basu, The Economics and Law of Sexual Harassment in the Workplace, Journal of Economic Perspectives—Volume 17, Number 3—Summer 2003—Pages 141–157. এই প্রবন্ধে ব্যবহৃত মূল উদাহরণ হল কর্মস্থলে যৌন হেনস্থা, যদিও মূল যুক্তিটির প্রাসঙ্গিকতা সর্বজনীন। যৌন হেনস্থা বিষয়টির অনেক দিক আছে, যা এই প্রবন্ধের মূল বক্তব্য থেকে আমাদের দুরে নিয়ে যাবে, তাই আমরা অন্য উদাহরণ ব্যবহার করছি।

[21] মৈত্রীশ ঘটক, দেহ মনের সুদূর পারে: বাজারের সীমা, অনুষ্টুপ শারদীয় সংখ্যা ২০০৯।

[22] ম্যানসার ওলসন-এর স্টেশনারি বনাম রোভিং ব্যান্ডিট-এর উদাহরণ এই ক্ষেত্রে খুব প্রাসঙ্গিক। Mancur Olson, 2000. Power and Prosperity: Outgrowing Communist and Capitalist Dictatorships, Oxford University Press.

[23] এখানে ধরে নেব, যে সাক্ষী দিতে আসবে, সে সব সময় সত্যি কথা বলবে। অবাস্তব ঠেকতেই পারে, কিন্তু সাক্ষীর মিথ্যে বলার ক্ষমতাকে এই গল্পে ঢোকালে আরও অনেক জটিলতা তৈরি হবে। আমাদের বর্তমান আলোচনার জন্য তার খুব একটা প্রয়োজন নেই।

[24] অর্থনীতির ভাষায় বললে, এখানে একেবারে ধ্রুপদী প্রিজনার্স ডিলেমা রয়েছে। এ বিষয়ে আরও আলোচনার জন্য দেখতে পারেন, Kaushik Basu, One kind of Power, Oxford Economic Papers, 1986 এবং http://www.econlib.org/library/Enc/PrisonersDilemma.html (accessed on 19.09.2014)।

[25] *একানায়ক: ভাল একনায়কের সন্ধানে*, অনুষ্টুপ, শারদীয় সংখ্যা, ২০১৩।

[26] Hayek, Friedman, and the Illusions of Conservative Economics, Robert M. Solow, The New Republic, November 16, 2012.

[27] http://www.spunk.org/texts/otherpol/critique/sp001280.html, accessed on 14.10.2014